নীল সাগর

রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

নীল সাগর—৮৬

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

আর্ম দাঁতে দাঁত পিষে বললো—এবার তোমার পালা মিঃ আলম। তোমার হৃৎপিণ্ড খুলে নেবো না, তোমার বুকের পাঁজর খুলে নেবো শয়তান......

বনহুরের এলোমেলো চুল দিয়ে তখনও পানি ঝরে পড়ছিলো, তোয়ালেটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আর্মের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একনজরে দেখে নিলো সে। আর্মের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, এই মুহূর্তে সে গুলী ছুড়বে।

বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠলো, উপরের দাঁতগুলো দিয়ে নিচের ঠোঁটখানাকে কামড়ে ধরলো শক্ত করে। একদণ্ড ভেবে নিলো, হত্যাকাণ্ডের যজ্ঞমঞ্চে আর্ম ছিলো কিনা। মনে পড়লো আর্মের টিকিও সেখানে দেখা যায়নি। তাহলে আর্ম সরে পড়েছিলো তারা সেখানে পৌঁছবার পূর্বেই। কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করবার সময় নেই বনহুরের, সে বিলম্ব না করে সহসা তোয়ালেটা ছুড়ে দিলো আর্মের ডান হাতের রিভলবারটার উপর।

সঙ্গে সঙ্গে আর্ম গুলী ছুড়লো।

কিন্তু রিভলবারের মুখে তোয়ালে পড়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, রিভলবারের গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো দেয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ঝাঁপিয়ে পড়লো আর্মের উপর।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো আর্ম ভূতলে।

শুরু হলো ভীষণ ধস্তাধস্তি।

আর্মের হাত থেকে রিভলবারখানা ছিটকে পড়লো দূরে।

আর্ম রিভলবার তুলে নেবার জন্য ভীষণভাবে প্রচেষ্টা চালালো কিন্তু বনহুরের শক্তির কাছে পরাজয় ঘটলো তার।

অবশ্য আর্মের দেহেও কম শক্তি ছিলো না। তবে বনহুরের শক্তিও কৌশলের কাছে তার শক্তি ও কৌশল টিকলো না। বনহুর চেপে ধরলো আর্মের গলা।

আর্মের চোখ দুটো বেরিয়ে এলো যেন, মুখ দিয়ে ফেনাযুক্ত লালা গড়িয়ে পড়লো, একটা গড় গড় শব্দ শোনা গেলো। আর্মের দেহটা শিথিল হয়ে আসছে, ঠিক ঐ মুহূর্তে ঝুমা এসে দাঁড়ালো দরজায়—বাবুজী, এ তুই কি করছিস্?

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের হাত দু'খানা হাল্কা হয়ে এলো, মুহূর্তে আর্ম বনহুরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো, তারপর দ্রুত পালিয়ে গেলো পিছন জানালা দিয়ে।

ঝুমা ছুটে গেলো বনহুরের পাশে—বাবু বাবু, কি হয়েছে তোদের? সিংহ আর বাঘে লড়াই শুরু করেছিলি যে বড়!

বনহুরের ক্রুদ্ধ ভাব তখনও কাটেনি। সে রাগে অধরদংশন করছিলো।

বনহুর বাথরুম থেকে বেরিয়েছিলো, তাই তখন তার গায়ে জামা ছিলো না। ঝুমার আগমনে সে কতকটা ইচ্ছা করেই আর্মকে মুক্তি দিয়েছে, নাহলে ওকে খতম না করে ছাড়তো না সে।

ঝুমা বললো—বাবু, তোদের বুঝি ঝগড়া হয়েছিলো, বল্ বল্ বাবু, কেন ঐ বাবুর গলা অমন করে টিপে ধরেছিলি? জানিস্ বাবু, জঙ্গলে যখন বাঘ আর ভালুকে লড়াই লাগে তখন কি মজা হয়? ঝুমা হাতে তালি দিয়ে বলে—আমরা দূর থেকে তামাসা দেখি, জানিস্ বাবু তখন কি মজা হয়......

বনহুর রাগ করে বললো—আমরা বুঝি বাঘ আর ভালুক?

বাবু, তুই বাঘ আর ঐ বাবু ভালুক। সত্যি, ঐ বাবু বড় মন্দ লোক, তুই ঠিক করেছিলি বাবু। কেমন মজা,. দেখলি না কেমন ভীরু কাপুরুষ লোকটা। এই দেখ বাবু, তোর জন্য আজ নতুন ফল এনেছি।

ঝুমা কোঁচড় থেকে কিছু ফল বের করে বাড়িয়ে ধরে—নে বাবু, ফল খেয়ে নে।

বনহুর তখনও ফুলছিলো, তার রাগ কমেনি—চোখেমুখে ফুটে উঠেছিলো একটা ভীষণ ক্রুদ্ধ ভাব কিন্তু উচ্ছল মেয়ে ঝুমা একটা ফল নিয়ে বনহুরের মুখে গুঁজে দিলো—নে বাবু, খেয়ে নে, খুব মিঠা ফল।

বনহুর বাধ্য হলো ফল খেতে।

ঝুমা বললো—ওকে মেরেছিস্ আমি খুব খুশি হয়েছি বাবু!

বললো বনহুর—কেন তুই খুশি হলি?

বড় বদমাইস, বড় মন্দ লোক ছিলো। জানিস্ বাবু, অই মন্দ লোকটা আমার দিকে কেমন কটমট করে তাকাতো। আমার মনে হতো ও আমাকে কামড়ে দেবে।

ঝুমার কথায় হাসি পাচ্ছিলো বনহুরের, তবু সে হাসতে পারলো না, গম্ভীর গলায় বললো—ওকে আমি শায়েস্তা করে দিয়েছি, ও বাবু আর ফিরে আসবে না।

সত্যি বাবু?

হাঁ।

বড় ভাল কাজ করেছিস্ বাবু।

আচ্ছা ঝুমা, তোর বাপু কেমন হলো?

ভাল না, বাপুর অসুখ আরও বেড়েছে। বাবু, তুই বড় ভাল লোক, আমার বাপুর কথা জিজ্ঞাসা করিস্, ঐ বাবু কোনোদিন বাপুর কথা জিজ্ঞাসা করে না।

বললো বনহুর—একদিন যাবো তোদের বাড়ি তোর বাপুকে দেখতে।

সত্যি যাবি বাবু?

হাঁ যাবো। তুই এখন যা ঝুমা।

বাবু, আমি কাজ করতে এসেছি। ঝাড়ু দেবো, জিনিসপত্র পরিস্কার করবো, বাগান সাফ করবো, ফুলগাছগুলোতে পানি দেবো, তারপর বাড়ি যাবো, বুঝলি বাবু? কথাটা বলে ঝুমা ফলগুলো টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর এবার তলিয়ে গেলো গভীর চিন্তায়......ঝুমাও নারী আর মিসেস এ্যামিও নারী কিন্তু দু'জনার মধ্যে আকাশ-পাতল প্রভেদ। এ্যামির আচরণ মনে পড়লো, কি জঘন্য নারী ছিলো সে— শুধু পাপ বাসনাই তার অন্তরে ছিলো না, তার অন্তরে ছিলো নানারকম কুৎসিত অভিসন্ধি। প্রতিদিন তার নির্দেশমত হত্যা করা হতো কত নিরীহ লোককে। যার শিকারে পরিণত হয়েছে বেচারা আরজু, যার শিকারে পরিণত হলেন তারই স্বামী মিঃ ইবন। নারী নয় পিশাচী। বনহুর তার সমস্ত সাধনা, সমস্ত ইচ্ছাকে বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু কি তাই, ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছে সে তার অদ্ভুত আলোকস্তম্ভ, যার ভিতরে প্রবেশ করে সে অনুচরদের কাছে আত্মগোপন করে কাজ সমাধা করতো। বনহুর তার সবকিছু নির্মূল করে দিয়েছে, নিঃশেষ করে দিয়েছে, এবার আর্মের পালা.........

হঠাৎ চোখ তোলে বনহুর, তার চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

রহমান এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, বনহুরকে কুর্ণিশ জানায়। চেহারাখানা তার জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে—মুখে একমুখ দাড়িগোঁফ, চোখ দুটো নিস্প্রভ।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো—রহমান এসেছো? ছাড়া পেয়েছো তুমি?

হাঁ সর্দার।

পুলিশ মহল তোমাকে খুব জেরা করেছিলো বুঝি?

হাঁ, করেছিলো, আমি যা ঘটেছিলো সব বলেছি। বেশ করেছো! বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—একটু পূর্বে আর্ম এসেছিলো।

আর্ম!

হাঁ, তোমার সঙ্গে এখানে তার পরিচয় ঘটেনি বা ঘটবার সুযোগ আসেনি, তার পূর্বেই তোমরা নিখোঁজ হয়েছিলে।

আর্ম!

হাঁ, তোমার সঙ্গে এখানে তার পরিচয় ঘটেনি বা ঘটবার সুযোগ আসেনি, তার পূর্বেই তোমরা নিখোঁজ হয়েছিলে।

সর্দার, কে সে—কি তার পরিচয় আর কেনই বা সে এখানে এসেছিলো? সর্দার, আর্ম নামটা আমার কাছে মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না।

ঠিকই বলেছো রহমান! বসো, অনেক কথা আছে। ফাংহা হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সত্য কিন্তু সমাধান হয়নি এখনও, কারণ এ্যামির ডান হাত তার সহোদর আর্ম এখনও জীবিত।

রহমান বলে উঠলো—মিসেস ইবন যে ফাংহা হত্যা রহস্যের মূল তা আগে জানতাম না সর্দার। আলোকস্তম্ভের মধ্যে তার আবির্ভাব ঘটতো, আলোকস্তম্ভের মধ্য হতে সে নির্দেশ দিতো তার অনুচর বা সহকারীদেরকে। সহকারীরা জানতো না তাদের পরিচালক কে। সে নারী না পুরুষ তাও জানতো না।

হাঁ, তুমি ঠিক বলেছো, মিসেস ইবন এত চতুর ছিলো—নিজ কু'কর্ম সমাধা করার জন্য সে তার সহকারীদের কাছে নিজের পরিচয় গোপন করে রেখেছিলো—সে কে এটা জানতো না তার দলের লোকজন।

সর্দার, আমিও জানতাম না, কতদিন আমাকে সেই আলোকস্তম্ভের সম্মুখে আনা হয়েছে, তবু আমি বুঝতে পারিনি স্তম্ভের ভিতরে ছিলো মিসেস ইবন। কণ্ঠস্বর শুনেও বোঝা যায়নি কিছু। সর্দার, আপনি দেওয়ানজীর বেশে

গিয়েছিলেন, আমি আপনাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি, একেবারে নিখুঁত হয়েছিলো আপনার ছদ্মবেশ। আপনি যখন আলোকস্তম্ভ থেকে মিসেস ইবনের মৃতদেহ বের করে আনলেন এবং বুঝিয়ে বলছিলেন কেমন করে তার মৃত্যু ঘটেছে তখন আমি আপনার কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারি। সব আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও আমি জানতাম আপনি হত্যারহস্য উদঘাটন না করে ছাড়বেন না। অন্ধকার কারাকক্ষে বসে আমি প্রতীক্ষা করতাম আপনার, নিশ্চয়ই আপনি আসবেন......

বলে উঠলো বনহুর—কিন্তু ফাংহা হত্যারহস্য উদঘাটন করেও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না, কারণ হত্যাকারিণী মিসেস ইবনের ডান হাত আর্ম জীবিত এবং একটু পূর্বে সে এসেছিলো আমার সঙ্গে মোকাবেলা করতে!

সর্দার!

হাঁ, তারই কথা বললাম।

কোথায় সে, আর কি করেই বা এমন সাহস সে পেলো?

আর্মকে তুমি জানো না রহমান, আমি জানি তার আসল পরিচয়। ফাংহার অধিবাসী সে বা মিসেস ইবন নয়।

তাহলে তারা কোথাকার লোক সর্দার?

হাঁ, সব বলবো, তাছাড়া ফাংহার কাজ এখনও আমাদের শেষ হয়নি, যদিও ফাংহা হত্যারহস্যের চাবিকাঠি ভেঙ্গে দিয়েছি।

সর্দার!

বসো, আর্ম তুমি আজ স্বাভাবিক নও, কারণ দীর্ঘদিন ধরে তোমার উপর চলেছে নির্মম অত্যাচার এবং অবিচার!

হাঁ সর্দার।

তবু তোমাকে জীবিত পেয়েছি, এটাই আমার বড় পাওয়া, কারণ এখন তোমাকে আমার নিতান্ত প্রয়োজন। রহমান আজ তুমি বিশ্রাম করে নাও।

ক্লান্ত বা অবসন্ন হবার বান্দা আমি নই, যদিও আপনি কিছুটা দুর্বল দেখছেন। আমি জানতে চাই সর্দার এ ব্যক্তি কে যার নাম আর্ম।

বলবো......হতঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো বনহুর, বললো—সন্ধ্যা হতে এখনও বেশ সময় বাকি আছে তবু দরজাটা আটকে দাও, কারণ পুলিশ মহল এখনও আমাদের ফলো করছে। কারণ এই বাংলোতেই বাস করতো হত্যারহস্যের নেত্রী.........

ঠিক বলছেন সর্দার। আমি দরজা বন্ধ করে আসছি। শুনতে চাই কে এই মিঃ আর্ম যে আপনার সঙ্গে মোকাবেলা করতে এসেছিলো।

রহমান উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো সর্দারের পাশে।

বনহুর তখন সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট পান করতে করতে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলো। রাশিকৃত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছিলো তার চারপাশে।

রহমান এসে বসলো নিকটে একটা টুলে।

বনহুর বললো—কিছু খেয়েছো রহমান?

হাঁ সর্দার, পুলিশ অফিসে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, কাজেই আমি এখন ক্ষুধার্ত নই।

বেশ তাহলে শোন মনোযোগ দিয়ে।

বলুন সর্দার?

এ্যামি এবং আর্ম আপন সহোদর। আসলে তারা ফাংহাবাসী নয়, তারা হলো সিংহা দেশের অধিবাসী। দীর্ঘকাল ধরে এই ভাইবোন বিদেশ থেকে ফাংহায় এসেছে এক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো ফাংহায় হার্ট বা হৃৎপিণ্ড সংগ্রহ করা। সিংহায় একটা হসপিটাল আছে, যেখানে প্রতিমাসে কমপক্ষে বিশ জন রোগীর হৃৎপিণ্ড বদলানো হয়ে থাকে।

সর্দার, হৃদপিণ্ড কি বদলানো যায় বা সম্ভব?

সবই সম্ভব রহমান, আজকাল সবই সম্ভব, তবে এ কাজ যত মহৎ হোক তবু অন্যায়, কারণ হৃৎপিণ্ড সংগ্রহে প্রতিদিন এ্যামি একটা করে লোককে হত্যা করতো। তার দলবল একাজে অবিরত নিয়োজিত ছিলো। এজন্য তাদের মোটা অংক দেওয়া হতো।

রহমান বললো—সর্দার, মাঝে মাঝে দেখেছি সেই ভূগর্ভ কক্ষে কারও না কারও বুক চিরে হৃৎপিণ্ড তুলে নিয়ে পুনরায় বদলানো হচ্ছে......কিন্তু কোনোদিন দেখিনি কেউ জীবিত হলো।

অহেতুক এই চরম সাধনা! এ্যামি এ সাধনায় সফলকাম হতো কিনা সন্দেহ। তাছাড়া তার এ সাধনা ছিলো অদ্ভুত। প্রতিদিন একটা নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাতো তার এ সাধনার শিকার হিসেবে। একটু থেমে বললো বনহুর শুধু তাই নয়, নিজ স্বামীকে এ্যামি হত্যা করেছে। জানো রহমান, ঐ মূহূর্তে সে আমার কক্ষে উপস্থিত ছিলো যাতে আমি তাকে কোনো রকম সন্দেহ করে না বসি।

তার মানে—সে যদি আপনার কক্ষেই ছিলো তবে কি করে সে তার স্বামীকে হত্যা করলো?

সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কারণ সে নিজ হাতে কোনো সময় হত্যা করতো না, হত্যা কাজ সমাধা করতো সে তার অনুচরদের দ্বারা। আর্ম এ ব্যাপারে বোনকে সহায়তা করতো। মিঃ ইবনকে হত্যা করেছে স্বয়ং আর্ম। বনহুর আপন মনেই একটু হেসে নিলো, তারপর বললো—অদ্ভুত অভিনয় অভিজ্ঞতা ছিলো এ্যামির—স্বামীর মৃত্যুশোকে যেভাবে সে কাতর হয়ে পড়েছিলো তাতে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না যে, সেই হত্যা কারিণী......একটু থেমে পুনরায় বললো বনহুর—রহমান, এবার আসল কথায় আসা যাক।

বলুন সর্দার?

আর্ম এবং এ্যামি শুধু হৃৎপিণ্ড সংগ্রহ ব্যবসাই করতো না, তাদের আরও এক ব্যবসা ছিলো বা আছে যা ফাংহারই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বের ক্ষতি সাধন করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তারা সোনা সংগ্রহ কাজেও লিপ্ত আছে। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে সোনা ক্রয় করে পাচার করছে এবং এ ব্যবসায় তারা লাখ লাখ টাকা উপার্জন করছে। আমি এ সংবাদ জানতাম না, জানতে পেরেছি অতি অল্পদিন হলো। রহমান, ভেবেছিলাম ফাংহা হত্যারহস্যের সমাধান করে ফিরে যাবো কান্দাই কিন্তু তা হলো না, এর একটা নতুন সমস্যা আমাকে ভাবিয়ে তুললো। যেমন করে হোক সিংহাদেশের কুচক্রীদের সোনা সংগ্রহ অভিযান নস্যাৎ করে দিতেই হবে, না হলে শুধু ফাংহা নয়, বহু দেশ নিঃস্ব হয়ে যাবে।

সর্দার, কেমন করে এদের সোনা সংগ্রহ অভিযান বন্ধ করবেন?

বনহুর সে কথায় শুধু হাসলো মাত্র, কোনো জবাব দিলো না। হেলান দিলো সে সোফায় ভালভাবে, তারপর নতুন একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো।

রহমান তাকিয়ে ছিলো আড়নয়নে সর্দারের মুখের দিকে। কতদিন পর সে ফিরে এসেছে সর্দারের পাশে। ভরসা ছিলো না রহমানের যে ফিরে আসবে সে আবার সেই বাংলোয়। আরও মনে পড়ে সেদিনের কথা, যেদিন রহমান আর আরজু বেরিয়ে গিয়েছিলো সরাইখানার উদ্দেশ্যে।

বনহুর যেন রহমানের মনের কথা বুঝতে পারে। সে কয়েকমুখ ধোঁয়া ছেড়ে একটু সোজা হয়ে বসে, তারপর বলে—রহমান, তোমাদের নিখোঁজ

হবার কাহিনী আমি আমি এখনও জানি না, কিভাবে তুমি আর আরজু উধাও হলে? গিয়েছিলে তো সরাইখানার উদ্দেশ্যে?

হাঁ সর্দার, কিন্তু সরাইখানা অবধি পৌছতে পারিনি আমরা।

কারণ?

সর্দার, আমি আর আরজু সরাইখানার পথে রওনা দিয়ে যখন অর্ধেক পথ এসে পড়েছি তখন দেখলাম পথের মাঝখানে পড়ে আছে এক বৃদ্ধ—তার শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। বৃদ্ধ আমাদের দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

আমি আর আরজু এগিয়ে গেলাম, বৃদ্ধের অবস্থা দেখে দয়া হলো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কে? কি জন্য এখানে পথের মধ্যে পড়ে আছো?

লোকটা আমার কথায় আরও বেশি জোরে কেঁদে উঠলো—এবং বললো—আমার কেউ নেই, আমাকে নিয়ে চলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় তোমাকে নিয়ে যাবো?

বললো লোকটা—ঐ যে টিলাটা দেখছো, ওখানে আমি থাকি। আমার ঘরবাড়ি কিছু নেই। আমি বড় অসহায়, নিয়ে চলো বাবা।

সর্দার, আমরা তখন পারলাম না তার কথা অবহেলা করতে। বিশেষ করে আরজু বেশি ব্যস্ত হলো লোকটাকে তার আশ্রয়স্থলে পৌছে দেবার জন্য।

বনহুর সিগারেট পান করতে করতে শুনছিলো রহমানের কথা।

রহমান বলে চলেছে—আমি বৃদ্ধটাকে কাঁধে তুলে নিলাম, তারপর এগিয়ে চললাম সেই টিলার দিকে, যে টিলার দিকে বৃদ্ধ আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলো, ঐ ওখানে আমার আশ্রয়স্থল।

তারপর?

সর্দার, বৃদ্ধটাকে বহন করে যখন ঠিক টিলাটার পাশে গিয়ে পৌছেছি অমনি দু'পাশ থেকে দু'জন লোক পিস্তল হাতে এসে দাঁড়ালো, বৃদ্ধটা তখন আমাদের পাশে থেকে সরে দাঁড়িয়েছে—সে আসলে বৃদ্ধ নয়, বৃদ্ধের ছদ্মবেশের ছিলো। সেও একটা পিস্তল বের করে কঠিন কণ্ঠে বললো—খবরদার, একচুল নড়বে না, নড়লেই গুলী ছুড়বো। সর্দার, যদিও আমার কাছে অস্ত্র ছিলো কিন্তু অস্ত্র বের করার সুযোগ পেলাম না। ইতিমধ্যে আরও চারজন অস্ত্রধারী লোক আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

একসঙ্গে তাহলে সাতজন হলো, কি বলো রহমান?

হাঁ সর্দার। সাতজনকে আমরা সেখানে তখন দেখতে পাচ্ছিলাম। ওরা আমাকে এবং আরজুকে রশি দিয়ে, চোখমুখ, হাত-পা সব মজবুত করে বাঁধলো। আমরা তখন তাদের কাজে কোনো রকম বাঁধা দিতে সক্ষম হলাম না, কারণ আমাদের কোনো উপায় ছিলো না। আমরা উভয়ে উভয়কে দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে ওরা কোথায় নিয়ে চললো তাও বুঝতে পারলাম না। তবে পিঠে ঠাণ্ডা এবং শক্ত কোনো একটা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করছিলাম। আমি বুঝতে পারছি আমার পিঠে পিস্তলের নল ঠেকে আছে, যে কোনো মুহূর্তে সেই নল থেকে গুলী বের হতে পারে।

যখন আমার চোখ খোলা হলো তখন আমি আর আরজুকে দেখতে পেলাম না। আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখছি, এমন সময় আমাকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তারা বললো, কাকে খুঁজছো? তোমার সঙ্গীটিকে বুঝি, কিন্তু সে আর তোমার সঙ্গে মিলিত হবে না, কারণ তাকে তোমার মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্দার, তার কিছু পর পরপরই একটা লোক একখানা বিরাট আকার ছোরা রক্তমাখা অবস্থায় নিয়ে এলো আমার সম্মুখে, সেই লোকটা শুধু বললো, পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্দার, তারপর আরজুর আর কোনো সন্ধান পাইনি।

থামলো রহমান।

বনহুর বললো—ওরা তোমাকে ঠিকই বলেছিলো, আরজুকে আমার নিকটেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

বনহুরের কথাটা শুনে খুশি হয়ে উঠলো রহমান—সত্যি, সর্দার আরজুকে ওরা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলো?

হাঁ সত্যি, তবে আরজু আসেনি, আরজুর মাথাটা সে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছিলো......

সর্দার! তাহলে আরজু আর জীবিত নেই?

না, সে ফাংহা হত্যারহস্য উদঘাটনে প্রথম আত্নহুতি দিয়েছে! তারপর একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়, বলে—রহমান, আরজুর মাথাটা আমি ঐ ওখানে মহুয়া তলায় পুঁতে রেখেছি!

সর্দার, এ আপনি কি বলছেন!

সত্যি, আরজুর মাথাটা আমাকে উপহার পাঠানো হয়েছিলো, কারণ হত্যারহস্যের নায়িকা এ্যানি জানতে পেরেছিলো আমি তোমাদের দু'জনকে নিয়ে ফাংহায় এসেছি ফাংহা হত্যারহস্যের সমাধান করতে।

ঠিক বলেছেন সর্দার, হত্যাকারিণী টের পেয়েছিলো আমাদের উদ্দেশ্য, নাহলে আমাদের দু'জনকে ওভাবে পথের মধ্যে পাকড়াও করতো না এবং আরজুও জীবন হারাতো না।

হাঁ, বেচারা আরজুর জন্য দুঃখ হয়......একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো বনহুর।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা ছায়া এসে পড়লো বনহুরের সম্মুখে দেয়ালে।

চমকে উঠলো রহমান।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো।

মুহূর্তে ছায়া সরে গেলো।

বনহুর বললো—আর্ম অথবা আর্মের লোক আড়াল থেকে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলো।

সর্দার, আমাদের এ বাংলোয় থাকা আর ঠিক হবে না।

কারণ?

কারণ শয়তানদল আমাদের গতিবিধি সর্বক্ষণ লক্ষ্য করে চলেছে।

রহমান, তুমি কি মনে করো আমি তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিনি? জানো আমি তাদের সব খবর রেখেছি। নাহলে হত্যারহস্যের মূল শিকড় উপড়ে ফেলতে পারতাম না। ফাংহা হত্যাকাণ্ড শেষ হয়েছে, এবার শয়তানদল তাদের পুরোন ব্যবসা সোনা সংগ্রহ অভিযানে আত্মনিয়োগ করেছে। স্বর্ণ অভিযানের অধিনায়ক হলেন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। রহমান, এর বেশি আজ জানতে চেও না, কারণ ছায়া আমাদের পিছনেই আছে।

বনহুর নিঃশেষ হওয়া সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে উঠে দাঁড়ালো, তারপর একটু হেসে বললো—আমি প্রথম থেকেই একটা ভুলপথে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমার সন্দেহ হচ্ছিলো সরাইখানার ম্যানেজারকে, কারণ আরজু এবং তুমি সরাইখানার উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলে, আর কিছু পর আরজুর মাথাটা কোনো এক বয় খাবার টেবিলেই রেখে যায়। তাই সরাইখানাকেই আমি হত্যাকাণ্ডের স্থান বলে মনে করি কিন্তু পরে জানতে পারি সরাইখানার ম্যানেজার যিনি তিনি অত্যন্ত মহৎ এবং সৎ ব্যক্তি, যদিও তার চেহারা বড় কুৎসিত কদাকার। একদিন আমি ভুল করে কিছু পয়সা তাঁকে বেশি দিয়ে আসি কিন্তু তিনি ঐ পয়সা নিজে এসে ডাকবাংলোয় আমাকে দিয়ে যান। অবশ্য আমি তখন তাঁকে বেশি সন্দেহ করি। এরপর আমি একদিন ছদ্মবেশে

সরাইখানাতে যাই এবং ইচ্ছা করেই আমার রুমালখানা ফেলে আসি। আশ্চর্য, ম্যানেজার রুমালখানা নিয়ে ডাকবাংলোয় হাজির হলেন এবং রুমালখানা আমাকে দিলেন।

সর্দার, আশ্চর্যই বটে, তিনি কি করে আপনার ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও আপনাকে চিনতে পারলেন!

আমি সেটা পরীক্ষা করার জন্যই ইচ্ছা করে আমার রুমাল সরাইখানায় ম্যানেজারের সম্মুখের পথে ফেলে রেখে চলে আসি। একটু থেমে বললো বনহুর—লোকটা অদ্ভুতও বটে......

এমন সময় বাইরে পদশব্দ শোনা গেলো।

রহমান ও বনহুর সজাগ হয়ে উঠলো।

দরজা খুলে দিলো বনহুর।

ভিতরে প্রবেশ করলো ডাকবাংলোর বয়, সেলাম জানিয়ে বললো—এক বাবু আপনাকে চিঠি দিয়েছে।

বনহুর চিঠিখানা হাতে নিয়ে বললো—আচ্ছা, তুমি যাও।

বয় চলে গেলো!

রহমান উন্মুখ হয়ে তাকালো বনহুরের হাতের চিঠিখানার দিকে।

বনহুর চিঠির খাম ছিড়ে শব্দ করে পড়লো—চিঠিতে লিখা আছে—

হত্যাকাণ্ডের মূল স্তম্ভ ভেংগে
দিয়েছো। বিদায় নাও, নইলে
তোমার জীবনলীলাও সাঙ্গ
হবে। মনে রেখো, আমি
তোমাকে ক্ষমা করবো না।
তোমার দেহের শক্তি আমার
বুদ্ধিশক্তির কাছে কিছু না।

—আর্ম

বনহুর চিঠি পড়া শেষ করে হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে। তারপর বললো—আর্ম তাহলে পালায়নি, আশেপাশেই আছে।

রহমান বললো—হাঁ সর্দার, সে ছায়ামূর্তি ধরে.........

পিছনেই আছে কি বলো? বনহুর রহমানের কথাটা শেষ করলো।

।

❑

জাহাজের একটা ক্যাবিনে পায়চারী করছিলো হিরন্ময়। লোকটা বাঙ্গালি তবে বহুদিন সে ফাংহায় অবস্থান করছে। এ জাহাজটা হিরন্ময়ের নিজস্ব জাহাজ। হিরন্ময় কোনো ব্যক্তির প্রতীক্ষা করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হঠাৎ পিছনে কেউ যেন এসে দাঁড়ালো।

ফিরে তাকালো হিরন্ময়।

এলোমেলো বেশে দাঁড়িয়ে আছে আর্ম। মাথাটা সে নিচু করে আছে, কোনো কথা বললো না।

আর্মকে লক্ষ্য করে বললো হিরন্ময়—কি হলো, মিঃ আলমকে খতম করে এসেছো তো?

চোখ তুললো আর্ম, বললো—না, তাকে খতম করতে পারিনি।

তবে কি করেছো তুমি?

আচমকা আক্রমণ করেও তাকে কাবু করতে পারনি। অসীম শক্তি ওর দেহে, তাছাড়া ভীষণ বুদ্ধি রাখে......

আর তোমার মাথায় সব বুঝি গোবর?

না, তাকে আমি শেষবারের মত চিঠি দিয়ে এসেছি।

কি চিঠি? কিসের চিঠি?

লিখেছি এদেশ ছেড়ে চলে না গেলে মৃত্যু তার অনিবার্য।

এ ধরনের চিঠি তুমি তো এর পূর্বেও দিয়েছিলে। তবুও সে তোমাদের সব সাধনা, সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তোমার বোন এ্যানিকে জীবন্ত হত্যা করেছে তারই আলোকস্তম্ভেব সুইচ টিপে।

আমি এর প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বো না স্যার।

কিন্তু সে সুযোগ তোমার আসবে তো?

স্যার, আমি মিঃ আলমকে হত্যা না করে ছাড়বো না এবং তার মাথাটা আমি উপহার স্বরূপ নিয়ে আসবো এখানে।

ধন্যবাদ, কিন্তু মনে রেখো, সে কম ঘুঘু নয়। যে ব্যক্তি তোমার বোন এ্যানির মত চতুর মেয়েকে শেষ করে ফেললো, তাকে কাবু করা কম কঠিন নয়।

দাঁতে দাঁত পিষে বললো আর্ম—স্যার, সে যতবড় ঘুঘুই হোক আমি তাকে ছাড়ছি না। শুধু আমার বোন নয়, আমাদের দলবলকে সে গ্রেপ্তার

করিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে দেওয়ানজীর বেশে। সে যেমন চালাক আমিও তেমনি কম চালাক নই।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো হিরন্ময়, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—তুমি যদি চালাকই হবে তাহলে তার কাছে নাকানি চুবানি খেতে না। তোমার বোনের সব সাধনা সে নস্যাৎ করে দিতে পারতো না। শোন আর্ম, আমি যা বলি সেইমত কাজ করো, যদি আমাদের ব্যবসা ঠিকমত চালিয়ে যেতে চাও।

বলুন স্যার।

আমাদের সোনা সংগ্রহ অভিযানের কথা সে জানতে পেরেছে, একথা কি সত্যি?

হাঁ সত্যি! আর সত্যি বলেই তো আমি কথাটা আপনাকে জানিয়েছি। সে শুধু আমাদের সাধনাই নস্যাৎ করেনি, আমাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও নষ্ট করে দেবার ব্রত নিয়েছে। যেমন করে হোক আমি তার সব ব্যর্থ করে দেবোই।

শুধু তুমি নও, আমরা যারা এই স্বর্ণ অভিযানে লিপ্ত আছি, তারা সবাই মিলে ঐ দুষ্ট নরাধমকে নিঃশেষ করে দেবো। শুধু একজন হয়ে এতবড় একটা প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেবে! আমাদের স্বর্ণ অভিযান শুধু ফাংহাতেই নয়, সমস্ত বিশ্বে আমাদের কারবার চলেছে। আর্ম?

বলুন স্যার।

তোমার আলোকস্তম্ভ সাধনা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এবার তুমি একান্ত মনে আমাদের কাজে সহায়তা করে যাও। দেখবে তোমার মত ধনকুবের ফাংহায় দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকবে না।

জানি স্যার। আর জানি বলেই তো আমি এসেছি আপনাদের সঙ্গে।

তোমার বোন এ্যানিকেও আমি আমাদের কাজে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম কিন্তু সে রাজি হয়নি এবং সে কারণেই তাকে আজ মৃত্যুবরণ করতে হলো। কাজেই তুমি আমার কথার কোনো সময় অন্যথা করো না।

স্যার, আমি তো আপনার বাধ্যগত দাস। তাছাড়া আমাদের যে ক'জন লোক আছে, সবাই আপনাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু......

বলো কিন্তু কি?

আমি আজও আপনাদের মূল আস্তানার সন্ধান জানি না। স্যার, আমাকে আপনারা যদি বিশ্বাসই করেন, তাহলে কেন আপনাদের আস্তানায় নিয়ে যান না! আমি শপথ করছি, চিরদিন আপনাদের ব্যবসায় সহায়তা করে যাবো।

এবার হিরন্ময় আসন গ্রহণ করলো। চোখেমুখে তার ফুটে উঠেছে এক পৈশাচিক হাসির আভাস, বললো সে—আর্ম, তুমি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সঙ্গে কাজ করছো, তাই না?

হাঁ স্যার।

তবু আমাদের আসল আস্তানার সন্ধান তুমি জানতে পারোনি।

হাঁ।

তাহলে বুঝতেই পারছো এখনও তুমি আমাদের বিশ্বস্ত অনুচর হতে পারোনি।

কেন, কেন স্যার? কেন আমাকে আপনারা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না?

তার কারণ তোমার মনের দুর্বলতা। তোমাকে আরও কর্মদক্ষ হতে হবে, তোমাকে আরও চতুর হতে হবে......

স্যার...

হাঁ, জানি তুমি নিজকে একজন দক্ষ কর্মী মনে করো এবং আরও মনে করো তোমার মত চতুর বুঝি আর কেউ নেই।

স্যার, আমি মানে আমার মধ্যে কোনো ত্রুটি আপনারা দেখতে পেয়েছেন কি?

ত্রুটি মানে—বিরাট ত্রুটি আছে তোমার মধ্যে, যার জন্য তোমার বোন এ্যানির সব সাধনা সমূলে বিনষ্ট হলো। জানো আর্ম, ডাকবাংলোয় তোমাদের পাশের কামরায় কে থাকে?

মিঃ আলম থাকেন।

হাঃ হাঃ হাঃ...হেসে উঠলো হিরন্ময়। বয়স তার কম নয়, দু'চারটে দাঁতও খসে পড়েছে তার শক্ত চোয়াল থেকে তবু তার হাসির আওয়াজে জাহাজখানা যেন দুলে উঠলো।

আর্ম আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো হিরন্ময়ের মুখের দিকে।

হিরন্ময় বলে চললো—যে তোমাদের পাশের কামরায় থাকে তার আসল পরিচয় তোমরা কেউ জানো না। মিঃ আলম নয় নয়, এটা তার ছদ্মনাম।

ছদ্মনাম!

হাঁ।

তবে কে সে আর কি তার আসল পরিচয়?

এখন না জানাই ভাল।

কেন স্যার?

ওর পরিচয় জানতে পারলে তোমরা আরও দুর্বল হয়ে পড়বে ওর কাছে, কাজেই পরে জানাবো। হাঁ, আরও একটা কথা শোন আর্ম, মনে রেখো ঐ ব্যক্তি সাধারণ লোক নয়। তোমার বোন এ্যানির সাধনা নস্যাৎ করে দিয়েই সে ক্ষান্ত হয়নি, তার সংগ্রাম এবার আমাদের স্বর্ণ অভিযান ধ্বংস করে দেওয়ার। যেদিন তোমার সঙ্গে তার মল্লযুদ্ধ হয়, তুমি পালালে, তার পরপরই গিয়ে হাজির হলাম আমি। আমি একটু ভুল করে ফেলেছিলাম যার জন্য আমার ছায়া গিয়ে পড়েছিলো তার সম্মুখের দেয়ালে! কিন্তু আশ্চর্য, আমার ছায়া লক্ষ্য করেও লোকটা এতটুকু সতর্ক হলো না বা ঘাবড়ে গেলো না, সে তার সঙ্গীকে যা বললো তা অতি ভয়ঙ্কর কথা, স্বর্ণ অভিযান বিরুদ্ধে এবার তার সংগ্রাম......

স্যার, আপনি নিজ কানে শুনেছেন?

হাঁ আর্ম, আমি নিজ কানে শুনেছি এবং সে কারণেই আমার জাহাজখানা নিয়ে এসেছি নীল সাগরে। নীল সাগরতলেই আছে আমার ঘাটি বা আস্তানা। সাধ্য নেই কারও আমাদের ঘাটির সন্ধান পায়, যেমন আজও তুমি জানো না ঘাটি কোথায়।

স্যার, আমাকে বলতে হবে—বলতে হবে আপনার আস্তানা কোথায়, নাহলে কাজ করে তৃপ্তি পাবো না। যে সোনা এবার চালান এসেছে তা আমার কাছেই আছে।

সে সোনা কি তুমি সঙ্গে এনেছো আর্ম?

না।

কেন?

সুযোগ পাইনি।

কোথায় রেখেছো সে সোনা?

আমাদের গোপন ঘাটিতে।

সেখানে তো ও গিয়ে হাজির হবেনা?

না স্যার, আমাদের সেই ঘাটির সন্ধান ও পাবে না।

তুমি তার পরিচয় জানো না বলেই ও কথা বলছো—জানলে বলতে না। একটু থেমে বললো হিরন্ময়—নীল সাগরতলের আস্তানা নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা আছে, কখন কিভাবে সে সন্ধান করে নেবে তা বলা যায় না। তবে হাঁ, সে কিছুতেই আমার নীল সাগরতলের ঘাটির খোঁজ পাবে না। আর্ম, তুমি যাও এবং যে সোনা তোমরা সংগ্রহ করেছো তা নিয়ে এসো, কিন্তু সাবধান ও যেন টের না পায়!

❑

ফাংহা সাগরতীরে দাঁড়িয়ে ছিলো এক ভদ্রলোক। সঙ্গে এক তরুণি। উভয়কেই বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিলো। তারা যেন কারও প্রতীক্ষা করছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনীভূত হয়নি।

সাগরতীর নির্জন হলেও মাঝে মাঝে দু'একটা স্পীড বোট দু'একজন তরুণী-তরুণীকে নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে এদিক থেকে সেদিকে।

ভদ্রলোকের চোখে কালো চশমা, সঙ্গের তরুণীর চোখে গাঢ় নীল কাঁচের চশমা।

ভদ্রলোক তরুণীকে লক্ষ্য করে বললো—ওরা কখন আসবে বলেছিলো মিস রীণা?

মিস রীণা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো—সন্ধ্যা ছয়টায় এসে পৌঁছবে।

ভদ্রলোকও নিজের হাতঘড়ি দেখে নিলো, তারপর বললো—ছয়টা চল্লিশ বেজে গেছে তবুও তো এলো না। মিস রীনা, তোমাকে তো সে ফাঁকি দেয়নি?

না, কারণ সে আমাকে বিশেষভাবে কথা দিয়েছে। তা ছাড়া আমার আত্নীয় হয় সে।

কিন্তু......

কোনো কিন্তু নয় মিঃ হিরন্ময়—এই তো আমি এসে গেছি। স্যুটপরা এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালো সেখানে। লোকটার হাতে একটা মোটা কালো চামড়ার ব্যাগ। সে ব্যাগটা উঁচু করে ধরে বললো—এতেই সব আছে, চলুন কোথায় যেতে হবে?

হিরন্ময় বললো—আমাদের জাহাজ কিছু দূরেই অপেক্ষা করছে মিঃ সেন। হিরন্ময় শিস্ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা স্পীড বোট দেখা গেলো সাগরবুকে কয়েক রশি দূরে। নিকটে পৌঁছতেও বিলম্ব হলো না। স্পীড বোটে শুধুমাত্র একজন চালক ছিলো।

স্পীড বোটখানা তীরে ভিড়তেই দ্রুত উঠে বসলো হিরন্ময়, মিঃ সেন ও মিস রীণা।

মিঃ সেনের হাতে রয়েছে ব্যাগটা।

হিরন্ময় বললো—শীঘ্র জাহাজে চলো।

স্পীড বোটখানা তীরবেগে এগিয়ে চললো। অল্পক্ষণেই তারা বেশ দূরে চলে গেলো। এবার জাহাজখানা দেখা যাচ্ছে।

জাহাজখানা স্থির হয়ে ভেসে আছে সাগরবুকে। একটা ভাসমান জন্তুর মত দেখাচ্ছে ওটাকে। জাহাজের চোঙ্গ দিয়ে ধীরে ধীরে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আকাশের বুকে।

স্পীড বোটখানা এসে জাহাজের পাশে ভিড়তেই দড়ির সিঁড়ি নেমে এলো নীচে। এবার স্পীড বোট থেকে ওরা তিনজন উঠে গেলো উপরে।

কালো ব্যাগটা এখনও মিঃ সেনের হাতেই রয়েছে। ব্যাগ হাতে জাহাজে উঠে এলো মিঃ সেন। তারপর হিরন্ময় এবং মিস রীণা।

জাহাজের এক নিভৃত ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই দরজা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেলো। বিরাট বড় ক্যাবিন।

যে ক্যাবিনের মেঝেতে সেদিন হিরন্ময়কে পায়চারী করতে দেখা গিয়েছিলো এ সেই ক্যাবিন। হিরন্ময় মিঃ সেনকে বললো—আপনি বড় ক্লান্ত, বসুন।

মিঃ সেন হেসে বললো—মোটেই ক্লান্ত নই। আমি আমার পাওনা নিয়ে এক্ষুণি ফিরে যাবো, কারণ সাগরতীরের অদূরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে। এই দেখুন, আমি আজ কি পরিমাণ সোনা এনেছি।

মিস রীণার মুখেই শুনেছি, আপনি অত্যন্ত কাজের লোক। আচ্ছা এবার কিছু পানীয় পান করুন, তারপর সোনা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা যাবে। হিরন্ময় মিস রীণার দিকে তাকালো।

মিস রীণা বললো—আচ্ছা আমি নিজেই ওর জন্য পানীয় আনছি।

মিস রীণা বেরিয়ে গেলো।

হিরন্ময় বললো—আপনার নামই শুনেছিলাম এতদিন কিন্তু সাক্ষাৎ ঘটেনি।

হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, ফাংহা সোনা সংগ্রহ ব্যাপারে আমি মিস রীণাকে বেশি সাহায্য করেছি।

শুধু পরিশ্রম দিয়েই সাহায্য করেননি, আপনি নিজের অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছেন। সত্যি, আপনার উপকারের কথা মনে থাকবে চিরকাল। আচ্ছা মিঃ সেন?

বলুন?

আপনি আমার কাছে কত টাকা পাওনা আছেন? অবশ্য হিসেবের খাতায় সব লেখা আছে, সেটা পরে খাতা খুলে হিসাব মিলিয়ে বিল দিবো। তবু আর কি জিজ্ঞাসা করছিলাম?

বললো মিঃ সেন—তিন কোটি সাত লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার।

ইতিমধ্যে কত পেয়েছেন?

পঞ্চাশ হাজার আপনি আমাকে দিয়েছেন, আর সবই তো বাকি আছে। মিস রীণা আমার আত্মীয়া, তাই......

এ সোনা কি আপনি শুধু ফাংহা থেকেই সংগ্রহ করেছেন, না অন্য কোথাও থেকে?

শুধু ফাংহা থেকেই এ সোনা আমি সংগ্রহ করেছি।

আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে আমি পারছি না, সত্যি আপনি কাজের লোক বটে। ফাংহা শহরে এত সোনা ছিলো, আমি এর আগে জানতাম না।

এমন সময়ে মিস রীণা ট্রের উপর কিছু পানীয় ও ফল নিয়ে উপস্থিত হলো।

মিস রীণার হাত থেকে পানীয় ও ফলমূলের ট্রে-খানা নামিয়ে রাখলো হিরন্ময় মিঃ সেনের সম্মুখে। বিপুল আগ্রহ হিরন্ময়ের অতিথি সেবায় তা তার কাজে এবং ব্যবহারেই প্রমাণ পাচ্ছিলো।

মিঃ সেন খুশি হয়েছে এবং সে নিজে ব্যাগ খুলে বের করলো সোনার চাপগুলো। টেবিলে সাজিয়ে রাখলো মিঃ সেন সেগুলোকে।

হিরন্ময় পানীয় ঢাললেন একটা কাঁচপাত্রে। তাকালো সে মিস রীণার দিকে।

মিস রীণার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো হিরন্ময়ের। মিস রীণা কাঁচপাত্রটি তুলে ধরলো মিঃ সেনের হাতে।

মিঃ সেন হাত বাড়িয়ে সহাস্যে কাঁচপাত্রটি হাতে নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরলো। ঢক্ ঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে পান করলো কিন্তু পরক্ষণেই দু'হাতে নিজের গলা চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠলো—উঃ একি হলো। আমাকে আপনারা কি খাওয়ালেন? কি খাওয়ালেন...কি...খাও..য়া...লে...ন...

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মিঃ সেন। তার সম্মুখস্থ টেবিলে সোনার চাপগুলো থরে থরে সাজানো পড়ে রইলো।

হিরন্ময় হেসে উঠে, হাঃ হাঃ করে। তার হাসির শব্দে দুলে উঠে জাহাজখানা। মিঃ সেনের কানেও গিয়ে পৌঁছে সেই হাসির আওয়াজ।

মিঃ সেনের চোখে তখন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার, সমস্ত দেহ তার ঘেমে নেয়ে উঠছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে ললাটে। একবার সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, তারপর বললো ... তো... ম্... রা... আ... মা... কে... কি... খা... ও... য়া... লে... সব... অন্ধ... কা... র... দে... খ... ছি... আ... লো... আ..... লো... সব... অন্ধ... কা... র... মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মিঃ সেন ক্যাবিনের মেঝেতে।

হিরন্ময় পুনরায় হেসে উঠলো, তারপর পা দিয়ে চীৎ করে দিলো মিঃ সেনের দেহটা। এবার মিঃ সেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, তার মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে একরাশ ফেনা।

হিরন্ময় মিস রীণাকে লক্ষ্য করে বললো—তিন কোটি সাত লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা......হাঃ হাঃ, এ টাকা আর কোনোদিন মিঃ সেন নিতে আসবে না বা চাইবে না। মিস রীণা, আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। হাত বাড়ায় হিরন্ময়, মিস রীণার দিকে।

মিস রীনাও হাত বাড়িয়ে দেয়।

হ্যাণ্ডসেক করে হিরন্ময় মিস রীণার সঙ্গে। এবার সে করতালি দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক প্রবেশ করে সেখানে।

হিরন্ময় ইংগিত করলো মিঃ সেনের দিকে।

লোক দু'জন এবার মিঃ সেনের দেহটা তুলে নেয়, তারপর বেরিয়ে যায় কেবিন থেকে। জাহাজের ধারে গিয়ে দাঁড়ায় ওরা, মিঃ সেনকে নিক্ষেপ করে সাগরবক্ষে।

ঝুপ করে একটা শব্দ হলো, নিমিষে তলিয়ে গেলো মিঃ সেনের দেহটা।

হিরন্ময় তখন মিস রীনার চিবুকখানা তুলে ধরে বললো—মিস রীণা, ফাংহায় যে সোনা আমরা সংগ্রহ করেছি, তা প্রায় পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের পরিমাণ হবে।

মিস রীনা বললো—ফাংহা ছাড়া বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের যে সোনা আমদানী হচ্ছে, তা বেশ কয়েক শ' কোটি টাকা হবে।

তা তো নিশ্চয়ই, বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে আমাদের কোম্পানীর গোপন বৈঠক হয়ে গেছে, অচিরেই তারা সোনা তুলে নেবার জন্য অর্ডার জারি করবেন এবং সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে দেশের একদল অধিপতি বা অধিনায়ক। তবে সবাই নয়, যারা আমাদের সঙ্গে কারবার করছেন, শুধু তারা।

এত সোনা যদি দেশ থেকে পাচার হয়, তাহলে দেশ চলবে কি করে হিরন্ময় বাবু?

দেশ! দেশ এখন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিজস্ব একটা জিনিস। দেশকে যেভাবে তারা চালাবেন, সেইভাবেই চলবে। জানো মিস রীণা, শুধু সোনা নয়, দেশের মূল্যবান যত সম্পদ আছে, তা সব ধীরে ধীরে পাচার হচ্ছে, আর হবে। যেমন খাদ্য শস্য সংগ্রহ অভিযান আমাদের চলেছে, তেমনি চলেছে এবার স্বর্ণ সংগ্রহ অভিযান। জানো মিস রীণা, আমরা এমন চালাকির সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি যাতে দেশের মানুষ কিছু বুঝতেও না পারে, অথচ তারা যেন মনে করে আমরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। হাঃ হাঃ হাঃ, নির্বোধ দেশ-বাসী, সত্যি মাঝে মাঝে দুঃখ হয় এত গর্দভ এরা।

মিস রীণা বলে উঠে—এরা কারা?

এই যে দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ।

কেন, এরা কি করেছে?

বলো কি করেনি। সব করেছে এরা, নিজেদের বাপ-মা-ভাই-বোনদের মুখের খাবার ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গোপনে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, তার বিনিময়ে পেয়েছে প্রচুর অর্থ। সেই অর্থ দিয়ে গড়েছে ইমারত, করেছে ঐশ্বর্য প্রাচুর্য, গাড়ি-বাড়ি সোনা-দানা।

সে সোনাও তো এবার তুলে দিচ্ছে?

হাঁ। দিচ্ছে নয়, দিতে বাধ্য হবে, কারণ তারা চালাক কিন্তু বুদ্ধিমান নয়। জানো আমরা বিদেশ থেকে এসে এসব দেশ থেকে কেমনভাবে ওদেরই পরম বন্ধু সেজে গোপনে শুষে নিচ্ছি ওদের বুকের রক্ত।

রক্ত!

হাঁ, রক্তই বটে। দেশ যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন দেখবে দেশের লোক কারও দেহে এক ফোটা রক্ত নেই। প্রথম মরবে দেশের তৃতীয় শ্রেণীর লোক, তারপর দ্বিতীয় শ্রেণী তারপর আসবে প্রথম শ্রেণীর লোকের পালা। অবশ্য তারা এখন এমন এক অবস্থায় অবস্থান করছে, যেখানে শুধু গোলক ধাঁধা।

গোলক ধাঁধা।

হাঁ, গোলক ধাঁধাই বটে। ঐশ্বর্যের ইমারতে বসে তারা কাচের চাকচিক্য উপভোগ করছে, তারপর যখন সময় আসবে তখন তাদের তাসের ঘর ভেংগে পড়বে......হাঃ হাঃ হাঃ, পরম বন্ধু সেজে আমরা তাদের বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছি—এখন বুঝবে না বুঝবে সেদিন.........হাঃ হাঃ হাঃ আপন মনে হেসেই চলে হিরন্ময়।

মিস রীণার দু'চোখে বিস্ময়।

❑

সর্দার, কে এই হিরন্ময়?

বন্ধুরাষ্ট্রের একজন গুপ্তচর, শুধু গুপ্তচরই নয়, একজন চোরাকারবারী। তবে ও একা নয়, বন্ধুরাষ্ট্রের বহু আছে যারা বন্ধু সেজে, বন্ধুর মুখোস পরে এই দেশের অধিনায়কদের হাত করে কার্যসিদ্ধ করে যাচ্ছে—করে যাচ্ছে দেশ ও দশের সর্বনাশ। বনহুর কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো।

রহমানও সর্দারের সঙ্গে আসন ত্যাগ করলো।

বনহুর পকেট থেকে বের করলো একটা ছোট ম্যাপ। ম্যাপখানা টেবিলে মেলে ধরে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—রহমান, এই যে সাগর দেখছো এটার নাম নীলসাগর। এই নীলসাগরের গভীর তলদেশে কোনো এক জায়গায় আছে বন্ধুরাষ্ট্রের গোপন এক ঘাটি। এই ঘাটি এরা তৈরি করেছে পৃথিবীর সোনা সংগ্রহের কারণে। এবার পৃথিবীব্যাপী শুরু হবে স্বর্ণ সংগ্রহ অভিযান। এই অভিযান শুরু হবার পূর্বেই বন্ধুরাষ্ট্র সজাগ হয়ে উঠেছে এবং আত্মনিয়োগ করেছে সোনা সংগ্রহে। হিরন্ময় হলো বন্ধুরাষ্ট্রের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি, এ কথা আমি একটু পূর্বেই বলেছি।

হাঁ সর্দার, আপনি বলেছেন।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ফিরে তাকালো রহমানের মুখে, তারপর বললো—এই হিরন্ময় কে এবং কোথা থেকে এসেছে, একথা ফাংহা অধিবাসী কেউ জানে না। একটি জাহাজ নিয়ে সে নীল সাগরের বুকে বিচরণ করে বেড়ায়—একটি নারী নাম মিস রীণা সে তার প্রধান সহকারিণী। মিস রীণা ছাড়াও আরও কয়েকজন আছে তার সহকারিণী এ জাহাজে। শুধু এই হিরন্ময় নয় বন্ধুদেশের বহু বন্ধু সাধুতার মুখোস পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এবার এদের অভিযান খাদ্যশস্য নয় স্বর্ণ অভিযান। প্রথমে এসেই হিরন্ময় দেখা করেছে ফাংহার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাদের সহযোগিতায় তারা এদেশে গোপনে ঘাটি করতে সক্ষম হয়েছে। গোপন বৈঠকে আলাপ হয়েছে কিভাবে সোনা সংগ্রহ অভিযান চলবে।

রহমান বলে উঠে—সর্দার, এ ম্যাপ আপনি কোথায় পেলেন এবং এসব কথা আপনি কি করে জানলেন?

একটু হাসলো বনহুর, তারপর বললো—ফাংহা হত্যা রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে নতুন এক রহস্যের সন্ধান পেয়েছি। রহমান—তাহলে এই নীল সাগরের তলদেশে স্বর্ণাগার, যেখানে জমায়েত হচ্ছে পৃথিবীর অনেক সোনা। কিন্তু এখনও নীল সাগরতলে সেই স্বর্ণাগার খুঁজে বের করতে সক্ষম হইনি—শুধু পেয়েছি এই নকশা। যে নকশা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সেই দুর্গম নীল সাগরের তলে।

রহমান বলে উঠলো—সর্দার, এতবড় জালিয়াত এই ফাংহায় বসবাস করে দেশের সর্বনাশ করে যাচ্ছে অথচ কেউ টের পায়নি বা পাচ্ছে না—এটা বড় আশ্চর্য।

হাঁ রহমান, আশ্চর্য বটে—বিদেশী রাষ্ট্রের এই অধিনায়ক এদেশে এমনভাবে পশার জমিয়ে তুলেছে যে, কেউ এদের সন্দেহের চোখে দেখবে না। সাধুতার মুখোস পরে এরা বিচরণ করে ফিরছে সভ্য সমাজে। লোকজনের মধ্যে একটা ত্রাসের সৃষ্টি করছে যে, সরকার অচিরে দেশ থেকে সোনা সরিয়ে নেবে এবং তা জোর পূর্বক নেওয়া হবে। এ কথা জন সমাজে প্রচার চালালো, চলার সঙ্গে সঙ্গে সোনা ক্রয় করা ব্যাপারে তারা হয়েছে উৎসাহী।

সর্দার, এ কথা আমারও কানে এসেছিলো। কে বা কারা বলেছিলো অচিরে দেশের সব সোনাদানা নাকি সরিয়ে নেওয়া হবে।

জানি না একথা কতখানি সত্যি, তবে সরকার সোনা সরিয়ে নেবার পূর্বেই গোপনে চলেছে স্বর্ণ সংগ্রহ অভিযান এবং সে অভিযান দেশকে একেবারে নিঃস্ব করে ফেলবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। দেশের জনগণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ব্যাপারে একেবারে নাজেহাল—পেরেশান হয়ে যার যা সোনা দানা আছে সব বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। তারপর এই একটা নতুন ভয় সবার মনে দানা বেঁধে উঠছে আর সেই কারণে সবাই গোপনে সোনা বিক্রি করে চলেছে বেশি টাকার লোভে।

তা সত্যি সর্দার, দেশ একেবারে সোনা শূন্য হয়ে যাবে......

হাঁ যাচ্ছে, যাবে কিন্তু এত সহজে দেশ এবং দশের সর্বনাশ আমি হতে দেবো না রহমান। আনমনা হয়ে যায় বনহুর।

রহমান কি যেন চিন্তা করলো, তারপর বললো—সর্দার, ফাংহা হত্যারহস্য উদঘাটন করলেন এবং ফাংহাবাসিগণকে রক্ষা করলেন সদ্য মৃত্যুমুখ থেকে, কিন্তু কেউ জানলো না কার প্রচেষ্টায় আজ ফাংহাবাসী এমন এক কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেলো। আবার আপনি সোনা হরণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন।

হাঁ রহমান।

কিন্তু এতে আপনার কি লাভ সর্দার?

রহমান, হঠাৎ আজ তোমার কণ্ঠে নতুন সুর শুনতে পাচ্ছি, আশ্চর্য হচ্ছি তোমার কথা শুনে।

সর্দার, বহুদিন আমি এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করেছি। মানুষ চায় নাম অথবা অর্থ। ফাংহা হত্যারহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে কোনোটাই আসেনি আমাদের ভাগ্যে, তবুও......

তবুও কেন আমি সংগ্রাম করছি, তাই না?

হাঁ সর্দার।

রহমান, তুমি কি জানো না তোমাদের সর্দার নাম এবং অর্থের লোভী নয়? সে চায় না মানুষ জানুক তার কাজের কথা। শুধু তার কর্তব্য দেশ ও দশের জনগণকে বিপদমুক্ত করা। আমি বেঁচে থাকতে পৃথিবীর বুক অন্যায় অনাচারে ভরে উঠবে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না। রহমান, তাই— তাই আমি ঝাপিয়ে পড়ি পৃথিবীর যে কোনো দেশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। হাঁ তুমি কেন, একথা তোমাদের বৌ-রাণীও বলছে বনহুর—কেন কেন আমি এসব করি? সে বোঝে না, তা ছাড়া যে কোনো নারী চায় তার স্বামী

সর্বক্ষণ পাশে থাক...তাই সে অবুঝের মত কথা বলে। আর তুমি, তুমি এভাবে বলবে আমি ভাবতেও পারিনি। শুধু কান্দাই বাসিগণই আমার আপনজন নয়, সারা বিশ্বের জনগণ আমার মা-বাপ-ভাই-বোন......

সর্দার জানি সব কথা!

তবুও কেন বলো?

সর্দার, ফাংহা হত্যারহস্য উদঘাটন ব্যাপারে ফাংহায় আমরা অনেকদিন হয় এসেছি। কান্দাই আস্তানা থেকে বারবার সংবাদ আসছে যেতে হবে, কিন্তু......

আবার আমি নতুন এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়লাম। হাঁ রহমান, এ সমস্যা সমাধান না করে আমি কান্দাই ফিরে যেতে পারবো না।

তা জানি সর্দার, কিন্তু......

কিন্তু কি?

আপনার সেই হাজরা গ্রাম থেকে মোখলেছুর সংবাদ পাঠিয়েছে সেখানে আমাকে যেতে হবে।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো—হাজরা গ্রাম!

হাঁ সর্দার, সেই সমিতির ছেলে মোখলেছুর!

মনে আছে ওদের সবার কথা! আমার জন্মভূমি ঐ হাজরা গ্রামের নিকটে। তাইতো ওই গ্রামগুলোর জন্য মন আমার কাঁদে।

সর্দার, শুনেছি সমিতির ব্যাপার নিয়ে গ্রামের মাতব্বর ইকরাম আলী......

হাঁ, প্রথমে খুব লেগেছিলো সে সমিতি এবং সমিতির ছেলেদের সঙ্গে। এমনকি পুলিশ ফোর্স দিয়ে সমিতি ধ্বসং করে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলো। এ ব্যাপারে একটা ছেলেও নিহত হয়েছিলো সে সময়। তারপর আমি সেই ইকরাম আলীকে সায়েস্তা করি এবং ভালভাবেই করি। সে যখন চরম অবস্থায়, যখন সে অন্ধ এবং পঙ্গু তখন সে নিজের ভুল বুঝতে পারলো এবং স্বীকার করে নিলো নিজের অপরাধ। অবশ্য তখন ইকরাম আলী সর্বহারা, ভিখারী......

এসব আমি কিছু কিছু জানি সর্দার, শেষবার আমি আপনার সঙ্গে ছিলাম কিনা।

হাঁ, তুমি আমার সঙ্গে ছিলে এবং কিছু কিছু জানোই বটে।

সর্দার—সেই গোলাপী বৌ যার উপর ইকরাম আলী জঘন্য আচরণ করেছিলো সেই গোলাপী কি শ্বশুরকে ক্ষমা করেছিলো?

হাঁ, অতি সরল সহজ মেয়ে গোলাপী, তাই শ্বশুরকে ক্ষমা করেছিলো এবং শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে গ্রহণ করেছিলো নিজ গুণে। সত্যি, রহমান, গোলাপী একটা আদর্শ মেয়ে, শেষ পর্যন্ত সে পাগল বোবা স্বামীকেই সরল মনে নেমে নিয়েছে।

সর্দার মেয়েটিকে আমি দেখেছিলাম। সে অতি মহৎ চরিত্রের মেয়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার চোখেমুখে একটা পবিত্রতার ছাপ আমি দেখেছি।

ঠিক তাই, নাহলে সে অমন পাগল স্বামীর সংসার করতে এগিয়ে যেতো না। রহমান, হাজরা গ্রাম থেকে কে কি সংবাদ পাঠিয়েছে বলতে পারো?

পারি সর্দার।

কে সংবাদ দিয়েছে?

সেই মোখলেছুর নামক ছেলেটা। আপনি যে ঠিকানা তাদের কাছে জানিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের কোনো বিপদ এলে বা কোনো প্রয়োজন হলে এই ঠিকানায় চিঠি দেবে—আমি পাবো এবং ছুটে আসবো তোমাদের পাশে।

হাঁ, যেবার হাজরা গ্রাম থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি, সেবার আমি সমিতির ছেলেদের কাছে আমার একটা ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম।

ঐ ঠিকানায় তারা চিঠি দিয়েছে, সেই চিঠির কথাগুলোই কায়েস আমাকে ওয়্যারলেসে জানিয়ে গিয়েছে সর্দার।

বনহুর একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে, হাতের সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে বলে—মোখলেছুরদের সমিতির কাজ পুরোদমে চলছিলো, এমন কি সরকারের সহায়তাও পাচ্ছিলো তারা......হঠাৎ আবার কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়েছে কিনা কে জানে। তবে ইকরাম আলী একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে, সে আর কোনো কু'কর্ম করতে পারবে না। আমি কান্দাই ফিরে গিয়েই একবার যাবো হাজরা গ্রামে।

রহমান বললো—হাঁ, তাই হবে সর্দার।

বনহুর ছোট্ট ম্যাপখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখলো।

❑

মিস রীণা, আজ আমার মত চতুর বুদ্ধিমান এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই বলেই আমি জানি। দেখলে কেমন করে কোটি কোটি টাকার মূল্যের সোনা আমি আত্মসাৎ করলাম। কথাগুলো বলে আসন গ্রহণ করলো হিরন্ময়।

মিস রীণা বললো—আপনি চতুর বুদ্ধিমান জানি, কিন্তু আজও আপনি আমাকে নীল সাগরতলে আপনাদের আসল আস্তানায় নিয়ে গেলেন না অথচ আমি আপনার ডান হাত।

সে কথা অবশ্যি সত্যি মিস রীণা, তুমি না হলে আমার যেন একদণ্ড চলতে চায় না, সত্যি তুমি আমাকে খুব ভালবাসো, তাই না?

আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা তার প্রমাণ তুমি বহুবার পেয়েছো।

হাঁ, এমনি করে আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করবে, তাতে আমি বেশি খুশি হবো—অত আপনি আর মহাশয় আমার ভাল রাগে না।

হিরন্ময়, তুমি আমার বাবার বয়সী......

তাই বুঝি দ্বিধা জাগে মনে?

হাঁ, সে কথা অস্বীকার করতে পারি না! মিস রীণা কথাটা বলে আসন গ্রহণ করলো।

হিরন্ময় টেবিল থেকে পানির পাত্র তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়লো মিস রীণার দিকে—নাও, লক্ষ্মী মেয়ে তুমি খেয়ে নাও। তুমি আমার দক্ষিণ হস্তই শুধু নও তুমি আমার.........

চুপ করো, এত বলতে হবে না। তবে মনে রেখো এবার আমাকে যদি তোমার নীল সাগরতলে নিয়ে না যাও, তাহলে.....

তাহলে?

তাহলে আমি তোমাকে কোন কাজে সহায়তা করতে পারবো না।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

আচ্ছা, এবার নিশ্চয় নীল সাগরতলে নিয়ে যাবো। কিন্তু সে জায়গা বড় দুর্গম, বড় কঠিন। নীল সাগরের গভীর তলদেশে সে স্থান........হিরন্ময়ের চোখ দুটো কেমন জ্বলে উঠে জ্বলজ্বল করে।

হিরন্ময়ের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে ঢক্‌ঢক্‌ করে পানীয় পান করলো মিস রীণা।

এমন সময় আর্ম প্রবেশ করলো সেখানে।

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চললো তাদের মধ্যে। মিস রীণাও যোগ দিলো তাদের আলোচনায়। তারপর আর্ম উঠে দাঁড়ালো, মিস রীণাও অনুসরণ করলো তাকে।

গভীর রাত।

জাহাজখানা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে। এ সাগর নীল সাগর নয়, এটা ফাংহা সাগর। সব সাগরের পানিই নীল কিন্তু এই ফাংহা সাগরের পানি নীল বা কালো নয়, কেমন যেন ঘোলাটে।

বিদেশী বন্ধু হিরন্ময় তাই তার জাহাজ রাখার জন্য বেছে নিয়েছে এই ফাংহা সাগর। অবশ্য ফাংহা সাগর হয়েই তাকে নীল সাগরে যেতে হয়। ফাংহা সাগর এসে মিলিত হয়েছে নীল সাগরে। যেখানে এই দুই সিন্ধুর সঙ্গম হয়েছে, সেখানে পানি কেমন যেন ঝাপসা নীল।

হিরন্ময় মাঝে মাঝে তার স্পীডবোটে জাহাজ ত্যাগ করতো এবং কোথায় যেতো কেউ তা জানতো না। এমন কি মিস রীণাকেও সে কোনোদিন সঙ্গে নিতো না। স্পীডবোট নিয়ে সোজা হিরন্ময় পাড়ি জমাতো যেদিকে ফাংহা সাগর গিয়ে মিলিত হয়েছে নীল সাগরে। অবশ্য হিরন্ময়ের অনুচরবর্গ জানতো সে স্পীড বোটেই যাচ্ছে এবং কোথায় যাচ্ছে এ সন্ধান কেউ রাখতে চেষ্টা করতো না।

আসলে হিরন্ময় কিন্তু স্পীডবোট ব্যবহার করলেও সে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে উঠে বসতো ডুবুজাহাজে। ছোট্ট সাবমেরিণ জাতীয় ডুবোজাহাজ। এই জাহাজের নাম ছিলো 'হিম্মু' হিম্মুর গতি ছিলো অত্যন্ত বেশি—মিনিটে এক শত মাইল চলতো এই ডুবোজাহাজ গভীর সাগরতল দিয়ে।

যেখানে খুশি যেতো হিরন্ময় এই সাবমেরিনে।

হিরন্ময় স্পীডবোট ও সাবমেরিন ছাড়াও ব্যবহার করে নৌকা এবং বজরা। অবশ্য যখন তার দল গ্রামাঞ্চলে কাজ করে তখন এই সব জলযানের প্রয়োজন হয় তার।

হিরন্ময় যে উদ্দেশ্য নিয়ে ফাংহায় এসেছে, সে উদ্দেশ্য সফলকাম হতে চলেছে। এতদিন দেশবাসীদের চোখে গোলক ধাঁ ধা লাগিয়ে দেশের জনগণের মুখের গ্রাস নিয়ে জাহাজ ভর্তি করে গোপনে পাচার করেছে,

এবার শুরু হয়েছে তার স্বর্ণ অভিযান। সোনা পাচার ব্যবসায় নতুন বা কাঁচা নয়। দেশ থেকে সরকার সোনা সিজ্ করে নেবার কথা চিন্তা করছেন। এমন সময় বিদেশী মহল সজাগ হয়ে উঠলো এবং তারা গুপ্তচর ছড়িয়ে দিলো সোনা সংগ্রহে। এইসব গুপ্তচরের মধ্যেই একজন হলো হিরন্ময়।

হিরন্ময় বাবু যখন শহরে যেতো এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতো তখন তাকে বিড়ালতপস্বীর মত দেখাতো। সাধুতার মুখোস পরে ঘুরে বেড়াতো সে সভ্যসমাজে।

হিরন্ময় জানতে পারলো ফাংহার সব সোনা এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এখনও বহু সোনা রয়েছে ফাংহার ঘরে ঘরে। মিঃ সেনকে হত্যা করে যদিও হিরন্ময় বহু সোনার অধিকারী হতে পেরেছে, তবুও আরও প্রয়োজন। কারণ তাদের কোম্পানী যাতে লাভবান হয় এবং নিজেও যাতে পৃথিবীর বুকে বিরাট একজন ঐশ্বর্যশালী হয়, এদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি।

ফাংহার অধিবাসী আংহাবারী ছিলেন বিরাট ধনী। তার ঘরে ছিলো প্রচুর সোনা, একথা জানতে পারে হিরন্ময় আংহাবারী বৃদ্ধ, তার স্বভাব স্বচ্ছ এবং মহৎ দানশীলও বটে। বহু গরিব ফাংহাবাসী তার দয়ায় উপকৃত।

আংহাবারীর ঐশ্বর্যের কথা জানতে পারে হিরন্ময় আর্মের কাছে। লালসায় দু'চোখ তার চক্‌চক্ করে উঠে, ভাবে কি করে এই আংহাবারীর ঐশ্বর্য এবং সোনা দানা আত্নসাৎ করা যায়।

আংহাবারীর একমাত্র কন্যা মালা এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী। সুন্দরী শিক্ষিতা মালার জন্য বহু ধনকুবের সন্তান ধন্না দেয় আংহাবারীর বাসভবনের আশেপাশে।

মালা কিন্তু কাউকে পাত্তাই দেয়না।

আংহাবারী তাঁর এক বন্ধুসন্তানকে পছন্দ করে রেখেছেন, মালা যখন শিশু তখন থেকে। ছেলেটাকে যদিও মালা দেখেনি তবে বাপের মুখে তার প্রশংসা শুনে শুনে মনে মনে ভালই বেসে ফেলেছে মালা সেই অজানা অচেনা যুবকটাকে।

ওর নাম মাহরুফ। বিদেশে থেকে সে লেখাপড়া করছে, লেখাপড়া শেষ করে ফিরে এলে তার সঙ্গে বিয়ে হবে মালার।

হিরন্ময় এই সুন্দর মালাকে হাত করার জন্য প্রচেষ্টা চালালো, কারণ সে জানে মালাকে কৌশলে হাত করতে পারলে আংহাবারীর সব ঐশ্বর্য তার হাতের মুঠায় চলে আসবে।

নতুন এক পথ ধরলো হিরন্ময়। সে মিস রীণাকে এক সময় বলে বসলো—মিস রীণা?

বলো হিরন্ময়?

এক কাজ তোমাকে করতে হবে।

এক কাজ কেন, বহু কাজ আমি তোমার জন্য করেছি।

আরও করতে হবে।

বলো কি করতে হবে?

ফাংহা অধিবাসিনী মিস মালাকে তোমার হাত করতে হবে কারণ মালাকে আমার চাই......

মিস মালা। অবাক কণ্ঠে বললো মিস রীণা।

হাঁ, ফাংহার অধিবাসী ধন কুবের আংহাবারীর একমাত্র কন্যা মালা। সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং অগাধ স্বর্ণের অধিকারিণী...

ও, এবার তাহলে নতুন এক ফুলের সন্ধান পেয়েছো হিরন্ময় তাই না?

মিস রীণা ফুলের সন্ধান নয়, ফুলের মধুর সন্ধান আমি পেয়েছি। ফুলটাকে হাতের মুঠায় নিয়ে ফুলের মধু নিংড়ে নেবো, তারপর ছোবড়াটা ছুড়ে ফেলে দেবো দূরে। তুমিই থাকবে চিরদিন আমার পাশে আমার সহকারিণী হিসেবে।

ঠিক বলছো তো?

হাঁ, ঠিক বলছি, তুমি ছাড়া কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না কোনো নারীকে। তুমি কেমন করে মোহাম্মদ একবাল হোসেনকে পরপারে পাঠিয়েছিলে! ভালবাসার শিকল পরিয়ে প্রথম হাত করেছিলে তাকে। তারপর কৌশলে তার মুখে তুলে দিলে সুধার পরিবর্তে বিষ। তারপর এলো আলী হাসান, তাকেও তুমি কত সহজে পরপারে ঠেলে দিলে, প্রেমের অভিনয় দেখিয়ে রাতের অন্ধকারে তার বুকে বসিয়ে দিয়েছিলে সূতীক্ষ্ণধার ছোরা। উঃ, কি রক্ত সেদিন আমি দেখেছিলাম, প্রথমে ভেবেছিলাম এ কাজ তুমি পারবে না কিন্তু কত সহজে তুমি সে কাজ সমাধা করেছিলে। হাঁ, মনে আছে রিবন সিংয়ের কথা, কত চালাক ছিলো রিবন সিং, তাকেও তুমি নিহত করেছো জাহাজের রেলিং থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে।

মিস রীণা হেসে উঠলো—হাঁ, রিবন সিংয়ের কথা মনে হলে আজও হাসি পায়। কেমন করে রিবন সিং সেদিন দাঁড়িয়েছিলো আমার দিকে মুখ করে,

পিছনটা ছিলো ওর সমুদ্রের দিকে! গাধাটা ভাবতেও পারেনি আমি তার সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করছি। সে একেবারে মশগুল হয়ে পড়েছিলো আমার প্রেমে। হাসছিলো সে আমার দিকে তাকিয়ে, কি বিশ্রি সে হাসি, আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম, দু'হাতে ঠেলে দিলাম সমুদ্র গর্ভে। আমি জানতাম গর্দভটা সাঁতার জানে না, তাই ওর জন্য ঐ পথ বেছে নিয়েছিলাম।

হিরন্ময় চূরুটে আগুন ধরায়, তারপর বলে উঠে রীণা, তুমি এই বয়সে অনেক কাজ করেছো......তুমি বাহবা পাওয়ার পাত্রী। আমাদের কোম্পানী তোমাকে মোটা পুরস্কার দান করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু তুমি আমাকে কি পুরস্কার দেবে হিরন্ময়?

যা চাইবে তাই পাবে তুমি।

সত্যি বলছো?

হাঁ, কিন্তু মিস মালাকে কৌশলে তুমি আমার হাতে অর্পণ করবে। অবশ্য এটা তোমার নতুন কাজ।

কিন্তু......

কোনো কিন্তু নয় মিস রীণা। মিঃ সেনকে হত্যা করে তুমি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছো। জানো মিস রীণা, মিঃ সেন কে এবং কি তার আসল পরিচয় ছিলো?

বিস্ময়ভরা চোখে তাকায় মিস রীণা।

হিরন্ময় বলে—মিঃ সেন আসলে মুসলমান ছিলো, সে হিন্দু নয়।

মিঃ সেন হিন্দু নয়?

না। সে মুসলমান।

সত্যি?

হাঁ, সত্যি সে মুসলমান এবং ফাংহাবাসী। সে আমার দলে যোগ দেবার জন্য নিজ নাম পাল্টে হিন্দু নাম ধারণ করে আমার দলে এসেছিলো, নাম ছিলো ওর মেহফুজ মাংতী। চালাক মেহফুজ মাংতী মিঃ সেন বনে গেলো এবং উঠেপড়ে সোনা সংগ্রহের কাজে লেগে পড়লো। সে বহু সোনা আমদানী করেছে এবং আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। সে তোমার কাছে বলেছিলো তোমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয় কিন্তু আসলে সে তোমার কেউ হয় না।

আমি জানতাম তবু তাকে অস্বীকার করিনি।

মিঃ সেন মানে মেহফুজ মাংতী নিজ দেশকে নিঃস্ব করে আমাদের কোম্পানীকে সবল করে তুলেছিলো......

আর তুমি তাকে তার উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েছো?

এ ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না মিস রীণা, কারণ যে পরিমাণ সোনা সে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, তার মূল্য কত তুমিও জানো। কত টাকা যদি আমরা তাকে বুঝিয়ে দিতাম তাহলে...লালবাতি জ্বলতো। মোহাম্মদ একবাল হোসেন, আলী হাসান, তারপর রিবন সিং সবাইকে যদি খতম না করতাম তাহলে আজ নীল সাগরতলে সোনার পর্বত তৈরি হতো না।

এত সোনা, আমাকে দেখাবে না কোনোদিন?

দেখাবো, সময় এলে দেখাবো। সেদিন তুমি হবে আমার জীবনসঙ্গিনী। কত সোনা-দানা আর স্তূপাকার অর্থ গড়া-গড়ি যাবে তোমার পায়ের তলায়। মিস রীণা, এবার তুমি আংহাবারীর মেয়ে মালাকে আমার হাতের মুঠায় এনে দাও, তারপর কি করতে হয় আমি করবো......

শেষে মিস মালার প্রেমে পড়বে না তো?

ভ্রুকুঁচকে হাসে হিরন্ময়—জীবনে বিয়ে করিনি। কাউকে জীবনসঙ্গিনী করতেও মন চায়নি। তুমিই শুধু আমার জীবনে একমাত্র......

তবে আমাকে জীবনসঙ্গিনী করে নিচ্ছো না কেন এতদিন?

নিবো, সময় এলে ঠিকই নেবো, ঘাবড়াবার কিছু নেই। মিস রীণা, হাতে হাত মিলাও......

মিস রীণা হাত বাড়িয়ে দেয়।

হিরন্ময় হ্যাণ্ডসেক করে রীণার।

বলে মিস রীণা—তোমাকে আমার বিশ্বাস হয় না হিরন্ময়।

কারণ?

কারণ আজও তুমি নীল সাগরের তলে তোমাদের স্বর্ণাগার দেখালে না।

দেখাবো এবং ভালভাবেই দেখাবো......সেদিন আর বেশি দূরে নয় মিস রীণা।

সত্যি বলছো?

হাঁ সত্যি। তুমি হবে নীল সাগরতলের স্বর্ণাগারের নীল কমল!

নীল কমল!

হাঁ।

এমন সময় হিরন্ময়ের কয়েকজন সহকারী এসে উপস্থিত হলো। উঠে পড়লো হিরন্ময়, জরুরি বৈঠক আছে তাদের।

❑

সর্দার!

বলো রহমান?

আপনি বলেছিলেন কোথাও যাবেন?

হাঁ, আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে, ফাংহা সাগরের অনতিদূরে একটা বাংলো আছে, সেই বাংলোয় আজ রাত চারটায় গোপন বৈঠক আছে হিরন্ময় ও তার দলবলের। তা ছাড়াও সেখানে থাকবেন ফাংহার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক।

সর্দার, এই বৈঠকে আপনি......

হাঁ, আমি উপস্থিত থাকবো।

বনহুর প্রবেশ করলো ড্রেসিংরুমে।

একটু পরে যখন সে বের হলো তখন তার শরীরে জমকালো ড্রেস। এটা বনহুরের নিজস্ব ড্রেস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মাথায় জমকালো পাগড়ি, কোমড়ের বেল্টে রিভলবার রয়েছে।

বাংলোর কক্ষে আয়নার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

রহমান দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে।

বনহুর আয়নায় নিজের পাগড়ীটা ঠিক করে নিয়ে ফিরে তাকালো দেয়ালঘড়িটার দিকে। রাত তখন দুটো বাজে বনহুর বললো—তাজ না থাকায় আমাকে অনেক অসুবিধা পোয়াতে হচ্ছে......

সর্দার, আমি একটা অশ্ব সংগ্রহ করেছি।

অশ্ব সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছো?

হাঁ, সর্দার।

বনহুর বললো—রহমান, তুমি সজাগ এবং সতর্ক থাকবে, কারণ এ ডাকবাংলো এখন আমাদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়।

জানি সর্দার।

বনহুর বেরিয়ে এলো ডাকবাংলো থেকে।

রহমানও তার পিছনে পিছনে ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে এলো এবং অন্ধকারে অন্তর্হিত হলো। কয়েক মিনিট অতিক্রম হতে না হতে ফিরে এলো একটি অশ্বের লাগাম ধরে।

বনহুর তখন বাংলোর বারান্দায় অপেক্ষা করছিলো।

রহমান অশ্ব নিয়ে আসতেই বনহুর এসে দাঁড়ালো অশ্বের পাশে। অশ্বের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে নিলো সে, তারপর উঠে বসলো।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

❑

ফাংহা অধিবাসীরা গভীর রাতে শুনতে পেলো অশ্বপদ শব্দ। আতঙ্কিত, হলো তারা রাত্রির নিকষ অন্ধকার ভেদ করে কোথাথেকে অশ্ব পদশব্দ শোনা যায় ভেবে পায় না তারা।

কিন্তু সবাই সজাগ হয়ে উঠলো।

ফাংহা অধিবাসীরা বহু অশ্ব পদশব্দ শুনেছে কিন্তু এমন শব্দ তারা কোনোদিন শোনেনি। কেউ যেন হাওয়ার বেগে অশ্বপৃষ্ঠে শক্ত মাটিতে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে কোথাও চলে গেলো।

শুধু ফাংহা অধিবাসীদের মধ্যেই কথাটা আলোড়ন সৃষ্টি করলো না, ফাংহা পুলিশ মহলেও সাড়া জাগালো। পুলিশ মহল তটস্থ হয়ে ভাবছে, এভাবে অশ্বচালনা করে গভীর রাতে কে কোথায় চলে যায়—নিশ্চয়ই কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির অশ্ব পদশব্দ।

পুলিশ মহল বহু গবেষণা করেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলো না। পুলিশ মহল শহরে-বন্দরে—গ্রামে পুলিশ প্রহরী মোতায়েন করলো।

এই অশ্ব পদশব্দ সবাই শুনতে পেলেও স্বচক্ষে কেউ অশ্বারোহীকে দেখেনি বা বলতে পারে না কোনো কথা তার সম্বন্ধে।

নানা জনের নানা কথা চলছে ফাংহা শহরে এই অশ্ব পদ শব্দ নিয়ে।

তখন বনহুর তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

গোপন বৈঠক চলেছে হিরন্ময়ের সঙ্গে ফাংহার কর্মকর্তাদের।

বিরাট কক্ষের মাঝখানে একটা গোল টেবিল। টেবিলে নানাবিধ খাদ্যসম্ভার থরে থরে সাজানো। চারপাশ ঘিরে বসেছে বুদ্ধিমান অতিথিগণ। চলেছে অতি গোপনীয় আলোচনা।

দেশের যারা হর্তাকর্তা, যারা দেশের রক্ষক তারাই গোপনে সোনা পাচারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে রাতের অন্ধকারে গোপনভাবে। কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না এরা দেশের কতবড় সর্বনাশ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে হাঁ, পূরণ হবে নিজেদের স্বার্থ, নিজেদের ইমারত গড়ে উঠবে আকাশ চুম্বি হয়ে। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে ঝলমল করবে ইমারতের প্রতিটি কক্ষ। দেশের সোনা বিদেশে পাচার করে এই কর্মকর্তা দল হবে এক একজন ধনকুবের। নিঃশেষ হবে দেশ ও দেশের জনগণ।

দেশকে নিঃশেষ করার এ এক নতুন অভিযান।

বৈঠক চলছে, এমন সময় একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো টেবিলের বুকে।

চমকে উঠলো অতিথিবৃন্দ।

হিরন্ময় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

আর্ম বলে উঠলো—স্যার, আমাদের গোপন বৈঠকের সন্ধান কেউ পেয়েছে তাহলে?

হিরন্ময় ছোরাখানা তুলে নিলো একটানে, ছোরার বাটে শুধু মাত্র একটা সাংকেতিক চিহ্ন ছাড়া কিছু নেই।

দেশের কর্মকর্তা যারা ঐ গোপন বৈঠকে উপস্থিত আছেন, তারা ঘাবড়ে যায় ভীষণভাবে। এ ছোরা কোথা থেকে এলো, কে নিক্ষেপ করলো? তবে কি কেউ তাদের এই গোপন বৈঠকের সন্ধান পেয়েছে?

বললেন একজন মহান অধিপতি—হিরন্ময় বাবু, আপনাকে বলেছিলাম অত্যন্ত গোপন স্থানে এই বৈঠকের আয়োজন করবেন।

অপর একজন মহান নেতা বললেন—আপনার জাহাজে এ বৈঠক হওয়া উচিত ছিলো।

প্রথম মহান অধিপতি বললেন—জাহাজে বৈঠক না দিয়ে এ স্থানে বৈঠক দিলেন কেন?

হিরন্ময় বললো—সেখানেও আমি নিশ্চিন্ত নই।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন একজন— বলেন কি হিরন্ময় বাবু?

হাঁ, ঠিকই বলেছি, কারণ একজন আমার পিছু নিয়েছে এবং সে সর্বক্ষণ আমাকে ফলো করে চলেছে। এ ছোরাখানা সেই নিক্ষেপ করে আমাকে জানিয়ে দিলো যে আমি তোমার গোপন বৈঠকের সন্ধান পেয়েছি।

কেউ আমাদের ফলো করছে, এ কথা সত্যি?

হাঁ।

তা হলে উপায়?

উপায় একটা পথ আমাদের বেছে নিতে হবে। হিরন্ময় দাঁতে দাঁত পিষে বললো—আমিও দেখে নেবো তাকে।

ছোরাখানা যদিও শয়তান ব্যক্তিদের মনে ভয়ের সঞ্চার করলো তবুও তারা দমে গেলো না। নতুনভাবে স্বর্ণ অভিযান চালাবার পরামর্শ করে চললো।

বললো হিরন্ময়—ছোরা নিক্ষেপকারীকে আপনারা না জানলেও আমি জানি। তার পরিচয় আপাততঃ আমি গোপন করে যাবো, কারণ তার মূল উদ্দেশ্য কি জানতে চাই আমি। যদি কৌশলে তাকে হাত করতে পারি তাহলে আমাদের স্বর্ণ অভিযান সার্থক হবে তাতে কোনো ভুল নেই।

বললো আর্ম—মেহফুজ মাংতীর মত ব্যক্তিকে আপনি করায়ত্ত করেছিলেন। কলের পুতুলের মত সে আপনার কথায় উঠতো বসতো, আর রিবন সিং যার প্রচণ্ড দাপটে বাঘ আর ছাগলে একঘাটে পানি খেতো, সেই লোক আপনার কাছে কুঁকড়ে গিয়েছিলো—আপনি তাকে......

শুধু এরাই নয়, এমনি বহু ব্যক্তিই আমার হাতের পুতুল বনে গেছে, যারা দেশের মহান অধিপতি। কথাগুলো বলে আড়নয়নে তাকালো হিরন্ময় ফাংহা অধীশ্বরদের দিকে। একটু থেমে সে বললো—নতুন এক ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছি, যার ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না..আমি তাকে আমার মুঠায় নিয়ে আসতে চাই।

মহান অধিপতিদের একজন বললেন—কে তিনি, কি তাঁর নাম হিরন্ময় বাবু?

হিরন্ময় একবার আর্মের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—তিনি ফাংহার ধনকুবের আংহাবারী । শুধু ধন কুবেরই নয়, তাঁর কাছে যে মজুত সোনা আছে তা বহু ধনবানের ঘরে নেই। আমি এই আংহাবারীকে হাতের মুঠায় আনতে চাই। তাকে করায়ত্ত করতে হলে চাই অসীম সাহস। আপনারা আরও একটা সুযোগ লাভ করবেন, সে হলো আংহাবারীর একমাত্র কন্যা মিস মালা।

মালা নামটা শোনামাত্র ফাংহা অধিপতিদের চোখগুলো চক-চক করে উঠলো, একজন বললেন—আংহাবারী একদিন আমাকে অপমান করেছিলো। হিরন্ময়, তাকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে আমি আপনাকে সহায়তা করবো সর্বান্তকরণে।

অপর একজন বললেন—আংহাবারীর ধনের গর্ব আছে, তিনি কোনোদিন আমাদের পরামর্শ নেন না বা কোনো কাজে আমাদের সহায়তা চান না। এমন কি আংহাবারী সরকারকে......

প্রথম স্বনামধন্য ব্যক্তি অপরজনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—মানতেই চান না।

হাঁ, সেই কারণেই আমি তাঁকে হাতের মুঠায় নিয়ে আসতে চাই এবং আংহাবারীকে হাতের মুঠায় আনতে হলে তাঁর একমাত্র কন্যা মিস মালাকে হাত করতে হবে। কথাগুলো বলে হিরন্ময় তাকালো সেদিনের বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মুখের দিকে।

স্বনামধন্য ব্যক্তিদের একজন বললেন—আজকের বৈঠক শেষ করে দেওয়া হোক, কারণ আমাদের বৈঠক সম্বন্ধে কোনো গুপ্তচর জ্ঞাত হয়েছে, ঐ ছোরাখানাই তার প্রমাণ।

হিরন্ময় বললো—ঠিক বলেছেন স্যার, আমাদের আজকের এ বৈঠক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো না।

নতুনভাবে গোপন বৈঠক দেবার কথা চিন্তা করে, সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করলো সবাই।

আড়ালে আত্মগোপন করে বনহুর সব লক্ষ্য করলো। অশ্ব তার অদূরে অপেক্ষা করছিলো।

মহান অধিপতিগণ যারা ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং হিরন্ময়ের স্বর্ণ অভিযানের সঙ্গে জড়িত আছেন তারা ছোরার এবং অশ্ব পদ শব্দ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পুলিশ মহলকে কঠিনভাবে সজাগ করে দিলেন এ অশ্বপদশব্দ কোন দিকে শোনা গিয়েছিলো আর কোন পথে অশ্বপদ চিহ্ন দেখা গিয়েছিলো।

সন্ধানী পুলিশবাহিনী ছড়িয়ে পড়লো গোটা শহরে।

আর্ম নিজে পুলিশবাহিনী নিয়ে ডাকবাংলো অভিমুখে রওয়ানা দিলো। সে সাধুতার মুখোস পরে যোগ দিলো পুলিশ মহলে।

ফাংহা পুলিশ প্রধান মিঃ লাভালর্ডকে হাত করলো সে কৌশলে।

লাভালর্ড প্রথমে বিশ্বাস করতে চাননি আর্মের কথাগুলো।

লাভালর্ড ফাংহাবাসী নন, তিনি হলেন লেবাননী। তবে চাকরীকালিন বেশ কিছু দিন যাবৎ ফাংহায় অবস্থা করছেন।

আর্ম এলো লাভালর্ডকে সাহায্য করতে। সে এসে জানালো, গভীররাতে যে অশ্বারোহী ফাংহাহার বুকে বিচরণ করে বেড়ায় সে সাধারণ লোক নয় এবং সে একজন দস্যু। ফাংহা অধিবাসীদের সুখ, শান্তি বিনষ্ট করার জন্য সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মিঃ লাভালর্ড উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং আর্মের সহায়তা কামনা করলেন।

আর্ম বললো—স্যার, আমাকে কিছু সংখ্যক পুলিশ দেন, আমি তাদের নিয়ে অভিযান চালাবো, রাত্রির অন্ধকারে যে দস্যু অশ্ব নিয়ে বিচরণ করে বেড়ায়, তাকে আমি খুঁজে বের করবো।

মিঃ লাভালর্ড খুশি হলেন আর্মের কথায় এবং তাকে পুলিশবাহিনী দিয়ে সাহায্য করবেন।

আর্ম সেখান থেকে বিদায় হয়ে সোজা সে চলে এলো বাংলোর মালী বিহাগীর বাড়িতে। বিহাগী তখন কিছু সুস্থ হয়ে উঠেছে।

আর্ম এসে বললো—বিহাগী তুমি এখন সুস্থ?

হাঁ বাবুসাব, এখন আমি একটু চলতে পারি।

শোন, তোমাকে একটা কথা বলবো বলে এসেছি। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে?

বলুন বাবু সাব, কি করতে হবে?

বাংলোয় যে বাবু থাকে তাকে তুমি দেখেছো?

দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন কথাবার্তা হয়নি। তবে ঝুমার মুখে শুনেছি বাবু খুব ভাল মানুষ......

বিহাগীর কথায় আর্মের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। আপন মনে বললো—ভাল মানুষই বটে। তারপর স্পষ্ট গলায় বললো—বিহাগী তুমি কবে থেকে কাজে যাচ্ছো?

বাবু শরীরটা এখনও দুর্বল, তাই ঝুমা আমাকে কাজে যেতে দেয়না।

তোমাকেই কাজে যেতে হবে। ঝুমার আর কাজে যাওয়া চলবে না।

কেন বাবু?

সে কথা পরে বলবো। বিহাগী শোন—যে বাবুর জন্য ঝুমা রোজ কাজে যায়.....

বাবুর জন্য ঝুমা রোজ কাজে যায়?

হাঁ, তুই জানিস না বিহাগী, ঐ বাবু তোর মেয়ে ঝুমার ইজ্জৎ নষ্ট করার জন্য তাকে কৌশলে হাত করছে।

তুই কি বলছিস্ বাবু?

হাঁ, ঠিক্ কথাই বলেছি, তোর মেয়ে ঝুমাকে সে হাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। দেখছিস না তাই তো ঝুমা এসে তোর কাছে তার এতো প্রশংসা করে। শোন, ঝুমাকে আর যেতে দিবি না ডাক বাংলোয়।

আচ্ছা বাবু, আচ্ছা?

শোন বিহাগী।

বল্ বাবু?

তুই কাল কাজে যাবি, এই নে এই ওষুধটা এটা লুকিয়ে রাখবি যখন বাবুর খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখবে তখন তুই ঐ খাবারের মধ্যে এই ওষুধ মিশিয়ে দিবি। খবরদার, ঝুমাকে যেন বলবিনা।

ঠিক ঝুমা ঐ সময় আড়ালে এসে দাঁড়ায়, সে শুনতে পায় আর্মের কথাগুলো। আর্ম তার বাবার হতে একটা কাগজের ছোট্ট মোড়ক দিয়ে বললো—তোকে মোটা বখশীস দিবো, কাজ শেষ হলে বুঝলি?

বাবু আমি এ কাজ পারবো না। বললো বিহাগী মালী।

আর্মের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, বললো সে—কি বললি বিহাগী?

আমি—আমি এ কাজ পারবোনা বাবু......

কি বললি! আর্ম পিস্তল বের করে চেপে ধরলো বিহাগী মালির বুকে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে—পারবি না?

বাবু!

তোকে পারতে হবে।

বিহাগী ওষুধের মোড়কটা হাতের মুঠায় চেপে ধরলো।

বেরিয়ে গেলো আর্ম।

ঝুমা সরে দাঁড়ালো দরজার আড়াল থেকে।

আর্ম চলে গেলে ঝুমা প্রবেশ করলো কুঠরীর মধ্যে। ঝুমাকে দেখেই বিহাগী ডাকলো—ঝুমা!

ঝুমা এগিয়ে এলো, সে একটু পূর্বে শুনেছিলো তার বাপু আর বাংলোর সেই বাবুর কথাগুলো। রাগে সে ফুলছিলো কাল নাগিনীর মত।

বাপুর পাশে এসে দাঁড়ালো কিন্তু কোন কথা সে বললো না।

বিহাগী বললো—ঝুমা, কাল থেকে তুই বাংলোয় কাজে যাবি না।

কেন যাবো না?

এখন আমার অসুখ সেরে গেছে, তোর আর যেতে হবে না।

আচ্ছা যাবোনা। কথাটা বলে ঝুমা বেরিয়ে গেলো কুঠরী থেকে।

পরদিন তার বাবা কাজে যাবার পূর্বেই ঝুমা গিয়ে হাজির হলো। বাগানের মধ্যে ফুল ঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো সে।

ঝাড়ু আর খুরপাই হাতে এলো বিহাগী। অসুখে ভুগে ভুগে হাড় জির-জিরা হয়ে উঠেছে তার দেহখানা। চুল রুক্ষ, চোখ ঘোলাটে। বিহাগী ঝাড়ু হাতে বাংলো পরিস্কার করে চলেছে।

ঝুমা দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে।

বাবু ঘরে নেই, বাইরে গেছে কোনো কাজে।

সরাইখানা থেকে বয় এসে টেবিলে খাবার চাপা দিয়ে রেখে গেলো।

সব দেখছে ঝুমা।

তার বাপু এবার প্রবেশ করলো বাবুর ঘরে।

ঝুমা আর স্থির থাকতে পারলো না, সে ফুল ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো জানালার পাশে, দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো কক্ষ মধ্যে। সে দেখতে পেলো তার বাপু খাবারের টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঝাড়ুখানা সে বগলে চাপা দিয়ে রেখেছে।

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ঢাকনা খুলে ফেললো তার বাপু, তারপর কাগজের মোড়ক থেকে গুড়া ওষুধ ফেলে দিলো খাবারের মধ্যে। এবার বিহাগী বেরিয়ে এলো আলগোছে ডাক বাংলোর কক্ষ থেকে।

যেমন বিহাগী দরজার কাছে এসেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর বাইরে থেকে ফিরে এলো। কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতেই ছালাম জানালো বিহাগী।

বনহুর বললো—তুমি বুঝি ঝুমার বাবা?

হাঁ বাবু।

তোমার অসুখ সেরে গেছে।

হাঁ, অসুখ সেরে গেছে।

ঝুমা আজ কাজে আসেনি?

না বাবু, ও আর কাজে আসবেনা। কথাটা বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলো বিহাগী মালী।

ঝুমা আর আসবে না.........আপন মনে কথাটা বনহুর উচ্চারণ করলো। বার বার ওর বাপুর কথার প্রতিধ্বনি হতে লাগলো কানের কাছে, না বাবু ও আর কাজে আসবে না......

কথাটা শোনার পর কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলো বনহুর। অন্যমনস্ক ভাবে বসে পড়লো সে একটা চেয়ারে। এই নির্জন বাংলোয় মাঝে মাঝে আসতো ঝুমা, চঞ্চল হরিণীর মত তাকাতো, কথা বলতো উচ্ছলভাবে, ভাল লাগতো বনহুরের কত কথা বলে তাকে হাসাতে চেষ্টা করতো, আর আসবে না সে......উঠে দাঁড়ালো বনহুর ওদিকের মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সে নীল আকাশের দিকে।

রহমান গেছে আজ কাজে, সে এখনও ফিরে আসে নি। একা নির্জন বাংলোয় বড় নিঃসঙ্গ লাগছে বনহুরের। বাথরুমে প্রবেশ করে ঠাণ্ডা পানিতে বেশ করে হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এলো কক্ষ মধ্যে।

ঝুমা কিন্তু আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করছিলো, সে দেখেছে তার বাপু বাবুর খাবারে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। বাবু জানে না তার খাবারে বিষ আছে। নিশ্চয়ই বাবু বাথ রুম থেকে বেরিয়ে খাবার খেয়ে নেবে।

ঝুমা অপেক্ষা করছে, তার বাপু বাংলোর কাজ শেষ করে চলে গেলেই সে খাবার সরিয়ে ফেলবে কিন্তু তার পূর্বেই বনহুর খাবার টেবিলে এসে বসলো।

ঝুমা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, যেমন করে হোক বাবুকে বাঁচাতে হবে।

এমন সময় বিহাগী বাংলোর কাজ শেষ করে নেমে পড়লো নিচের পথে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলো সে একবার, মনের মধ্যে ঝড় শুরু হয়েছে তার। লোকটা গরিব বটে কিন্তু শয়তান নয়। পরের অন্যায় করা সে পছন্দ করে না, বরং সে ঘৃণাই করে। আজ সেই বিহাগীকে এত বড় অন্যায় কাজ করতে হলো। বিহাগী মালী পথ চলছে আর বার বার ফিরে তাকাচ্ছে বাংলোর দিকে। বাবুটি হয়তো এতক্ষণ খাবার টেবিলে বসে গেছে! এবার তিনি খেয়ে ফেলবেন খাবারগুলো, তারপর ঢলে পড়বেন চেয়ারের উপরে.........

বাপুকে ডাকবাংলো থেকে নেমে যেতে দেখেই ঝুমা প্রবেশ করলো ভিতরে, ঠিক্ ঐ মুহূর্তে বনহুর খাবার টেবিলে বসে মাত্র খাবার তুলে মুখে নিতে গেছে।

ঝুমা ছুটে এসে খাবার সহ হাতখানা চেপেধরে বনহুরের, বাবু ও খাবার তুই খাস্‌নে......বাবু......

বনহুর বিস্ময় ভরা চোখে তাকালো ঝুমার দিকে। একটু পূর্বে বলে গেলো বিহাগী মাঝি, ও আর বাংলোর কাজে আসবেনা। খাবার সহ বনহুরের হাত খানা তখনও ঝুমার হাতের মুঠায়। বনহুর স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ঝুমা বললো—বাবু ওতে বিষ আছে ও খাবার তুই খাস্‌ না।

বনহুর বললো—বিষ!

হাঁ বাবু বিষ! ঐ খাবারে বিষ আছে........

তুমি কি করে জানলে ঝুমা?

বাবু ও কথা তুই জিজ্ঞাসা করিস্‌ না, আমি বলবো না। আমি বলবো না বাবু, তুই ঐ খাবার খাস্‌ না।

বনহুর হাত থেকে খাবার নামিয়ে রাখলো।

ঝুমা বললো—বাবু আয় আমার সঙ্গে।

কোথায়?

দেখবি আয়। ঝুমা খাবারের থালাটা তুলে নিলো হাতে তারপর বেরিয়ে এলো বাংলোর বারান্দায়।

বারান্দায় পাশেই একটা বেওয়ারিশ কুকুর বসে বসে হাঁপাচ্ছিলো। ঝুমা এক মুঠো খাবার নিয়ে কুকুরটার সামনে ফেলে দেয়।

কুকুরটি ক্ষুধার্তছিলো সে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে খাবারগুলো। বনহুর আর ঝুমা তাকিয়ে আছে কুকুরটার দিকে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেলো। কুকুরটা কেমন যেন অদ্ভুত স্বরে আওয়াজ করে উঠলো তারপর গড়া-গড়ি দিতে শুরু করলো ঘাসের উপর। কেটে গেলো কয়েক মিনিট ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এলো কুকুরটা তারপর নীরব হয়ে গেলো। ওর মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো একরাশ ফেনাযুক্ত লালা।

ঝুমা বললো—বাবু দেখলি, ঐ খাবার খেলে তোর অবস্থা অমনি হতো।

বনহুর বুঝতে পারলো ঝুমা তাকে সদ্য মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করছে। সে যদি খাবারগুলো খেতো তা হলে আর রক্ষা ছিলোনা। বললো বনহুর— ঝুমা তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না।

বাবু তোকে বাঁচাতে পেরেছি এই তো আমার আনন্দ। বাবু......

বনহুর নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকায় ঝুমার দিকে।

❑

বিহাগী সবে মাত্র শয্যায় শয়ন করতে যাবে ঠিক ঐ মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে কে যেন নড়ে উঠলো। বেরিয়ে এলো আর্ম হাতে তার পিস্তল, দাঁতে দাঁত পিষে বললো—বিহাগী!

চমকে উঠলো বিহাগী, সম্মুখে যমদূত দেখার মত ভয়ে ভীত হলো সে।

বিহাগী মালীর বুকটা কেঁপে উঠলো থরথর করে। বললো বিহাগী—বাবু আপনি......

হাঁ। শয়তান তোকে যে কাজ করতে বলেছিলাম করেছিস?

করেছি বাবু, আপনি যে ওষুধ আমাকে দিয়েছিলেন সেই ওষুধ আমি বাবুর খাবারে মিশিয়ে দিয়েছি।

বিহাগীর বুকে পিস্তল চেপে ধরলো আর্ম, কঠিন কণ্ঠে বললো—জানিস, মিথ্যা কথা বললে মরতে হবে?

জানি বাবু, তাই তো আমি আপনার দেওয়া ওষুধ বাবুর খাবারে মিশিয়ে দিয়েছি।

মিথ্যা কথা।

বাবু মিথ্যা আমি বলি না।

তবে তোর সেই বাবু বেঁচে আছে কেন?

বেঁচে আছে? বিহাগীর মুখটা এতক্ষণ বিষাদময় ছিলো, সে জানতো, তার দেওয়া বিষ খেয়ে বাবুটি এতক্ষণ মারা পড়েছে, তাই বুকটা তার দুঃর্ভাবনায় অস্থির ছিলো। এখন কথাটা শোনা মাত্র দ্বীপ্ত হয়ে উঠলো মালির চোখ দুটো। আপন মনেই বললো—বাবু তা হলে মরেনি?

না।

কিন্তু আমি তো বাবুর খাবারে বিষ ঢেলে দিয়েছিলাম।

সত্যি করে বল?

হাঁ, সত্যি করে বলছি।

তবে সে মরলো না কেনো?

জানি না।

সব তোর চালাকী—সব মিথ্যা কথা।

না, না, বাবু আমি চালাকি করিনি, মিথ্যা কথা বলিনি। বাবু কেন মরেনি তাও আমি জানি না।

আর্ম চেপে ধরেছিলো পিস্তলখানা ওর বুকে। এবার সে পিস্তলখানা সরিয়ে নিয়ে বলে—যা তোকে এবারের মত মাফ করলাম। পকেট থেকে পুনরায় একটা প্যাকেট বের করে বিহাগী মালির হাতে গুজে দিলো—এই নে, এবার যে ওষুধ দিলাম এটা মিশিয়ে দিবি বাবুর খাবারের সঙ্গে। যদি ঠিক মত কাজ করতে না পারিস, তাহলে এই পিস্তলের একটা গুলী তোকে হজম করতে হবে।

ঝুমা ঐ মুহূর্তে বাড়ি ছিলো না, যখন আর্ম বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক ঐ সময় ঝুমা প্রবেশ করে সেখানে। আর্মকে দেখেই ঝুমা বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠে, তার দেহের লোম গুলো খাড়া হয়ে যায়। এই বাবু যে অহেতুক এখানে আসেনি এটা সত্য।

আর্ম ঝুমার দিকে লোভাতুর দৃষ্টি মেলে তাকায়, তারপর বাঁকা চোখে টিপ্পনী কেটে বলে—আবার আসবো, তোমাকে আমার চাই.......কথাটা চাপা গলায় বলে বেরিয়ে গেলো সে।

ঝুমা ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো তারপর দ্রুত কুঠরীমধ্যে প্রবেশ করলো।

বিহাগী মালীর হাতের মুঠায় তখনও কাগজের মোড়কখানা ধরা আছে। ঝুমার দৃষ্টি এড়ায় না, সে বলে উঠে—বাপু তোর হাতে ওটা কি?

বিহাগী মালী তাড়াতাড়ি হাতের মোড় লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে, বলে—ও কিছু না।

ঝুমার কাছ থেকে সরে যায় বিহাগী।

ঝুমার চোখে মুখে একটা ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠে। সে দাঁতে দাঁত পিষে আপন মনে বলে—বুঝেছি, ঐ বাবু তোকে আবার বিষ দিয়েছে, হাঁ, আমিও দেখে নেবো তুই কি করে বাবুকে বিষ খাওয়াস।

ঝুমার চোখের ঘুম ছুটে গেলো, সে সব সময় তার বাপকে পাহারা দিয়ে চলতে লাগলো। কখন বিহাগী মালী কোথায় যায়, সেদিকে রইলো তার খেয়াল।

পরদিন বিহাগী মালী যখন কাজে বের হলো তখন ঝুমাও আড়ালে আত্মগোপন করে বের হলো। সে তার বাপু পৌছবার পূর্বেই পৌছে গেলো ডাকবাংলোয়।

যে কক্ষে বনহুর থাকে সেই কক্ষের দরজার আড়ালে এসে লুকিয়ে পড়লো সে।

বনহুর তখন রহমানের সঙ্গে কোনো ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল, কথা শেষ হলে বেরিয়ে গেলো রহমান।

বনহুর বালিশটা বুকের নিচে রেখে উবু হয়ে শুয়ে একটা পত্রিকা টেনে নিলো।

ঝুমা দাঁড়িয়ে আছে আড়ালে, তার দৃষ্টি রয়েছে কক্ষ মধ্যে, বাবুকে সে লক্ষ্য রেখেছে আর লক্ষ্য রেখেছে কক্ষের প্রতিটি জিনিসের প্রতি।

হঠাৎ ফিস ফিস শব্দে ফিরে তাকালো ঝুমা। দেখলো তার বাপু বাংলোর বয়ের সঙ্গে গোপনে কথা বলছে। বয়ের হাতে ট্রে, ট্রের উপরে দু'কাপ চা।

বিহাগী বললো—লিমু এই ওষুধ বাবুর চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দে তোকে বখশীস দিবো।

লিমু ডাকবাংলোর নতুন বয়ের নাম!

লিমু কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বিহাগী একটা চায়ের কাপে কাগজ থেকে গুঁড়ো গুলো ঢেলে দেয়, তারপর বলে—এই চাটা বাবুকে দিবি আর এই কাপ দিবি বাবুর বন্ধুকে, বুঝলি?

লিমু বললো—আচ্ছা।

বিহাগী কাজে মনোযোগ দিলো।

লিমু চায়ের ট্রে হাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো বনহুরের কক্ষে। ঝুমা কিন্তু সব দেখেছে, বয় ট্রে হাতে এগিয়ে আসতেই সে আড়াল থেকে বেরিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। একটু হেসে বলে ঝুমা—লিমু দে, আমার কাছে চায়ের ট্রে দিয়ে দে, আমি বাবুকে চা দিয়ে আসি।

না তুই যা আমি দেই।

লিমু কথা শোন, তুই যা কাজ করগে। আমি বাবুর ঘরে যাচ্ছি তাকে চাটা আমিই দিবো। জানিস, বাবু আমাকে পিয়ার করে।

ও......বলে একটু হেসে চায়ের ট্রেটা ঝুমার হাতে দিয়ে নিজের কাজে চলে যায় লিমুবয়।

ঝুমা চায়ের ট্রে হাতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে।

বনহুর তখন আপন মনে সংবাদ পত্র পড়ছিলো। সে মনে করে বয় বুঝি চা নিয়ে এলো কারণ একটু পূর্বে রহমান বয়কে চা আনতে বলেছিলো।

সংবাদ পত্র থেকে চোখ না তুলেই বলে বনহুর—দে চা এনেছিস।

ঝুমা কোন কথা না বলে পরিস্কার চাটা তুলে দেয় বনহুরের হাতে আর যে চায়ে বিষ মিশানো ছিলো ঐ চা সে নিজের হাতে তুলে নেয়।

বনহুর চায়ের কাপে চুমুক দিতেই ঝুমা বলে উঠে—বাবু।

কে, ঝুমা!

হাঁ বাবু।

বনহুর সোজা হয়ে বসে বলে—অসময়ে তুমি?

এলাম বাবু। একটু থেমে বলে—বাবু তুই চা খেলি।

বনহুর অবাক কণ্ঠে বলে—কেনো?

চায়ে বিষ ছিলো।

বিষ!

হাঁ বাবু, এখানে তুই আর থাকিস না, তোকে ওরা বিষ খাওয়াবে। এই কাপে বিষ দিয়েছিল তোকে মেরে ফেলবে বলে। এই কাপ পাল্টে তোকে দিয়েছি। বাবু চলে যা, বাবু আমার কথা শোন তুই, চলে যা।

ঝুমা!

হাঁ বাবু, আমি দেখেছিলাম বলে তোকে বাঁচাতে পারলাম— নাহলে তুই মরে যেতিস, মরে যেতিস।

বনহুর চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো টেবিলে। ঝুমাও বিষ দেওয়া চা জানালা দিয়ে ফেলে দিলো।

আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখলো আর্ম।

প্রথম দিন বিষ দেওয়া সত্ত্বেও কি করে বাঁচলো তার শত্রু ভেবে পায়নি এ জন্য পরদিন আর্ম নিজে আত্মগোপন করে সব দেখছিলো। দেখলো ঝুমার এ সব কাজ, তার বাপ ঠিকই খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলো কিন্তু ঝুমাই সব নষ্ট করে দিয়েছে।

আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত পিষলো আর্ম। মিঃ আলম তার বোনকে হত্যা করেছে, নষ্ট করেছে বোনের সমস্ত সাধনা বিনষ্ট করেছে আলোক স্তম্ভ......না ক্ষমা নয়, ওকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না! আপন মনেই কথাগুলো বলে আর্ম, চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হলো তার।

বনহুর ঝুমাকে লক্ষ্য করে বলছে তখন—ঝুমা তোমাকে কি দিবো যা দিয়ে তোমার এ ঋণ শোধ হবে।

বাবু তুই আমাকে ভালবাসিস্ এই তো আমার পুরস্কার। আমি কিছু চাই না বাবু।

তবু দিবো কারণ তুমি আমার জীবন রক্ষা না করলে আমি এতক্ষণ পরপারে চলে যেতাম। এই নাও ঝুমা আমার এই আংটি তোমাকে দিলাম।

বনহুর নিজের আংগুল থেকে আংটি খুলে পরিয়ে দিলো ঝুমার আংগুলে।

ঝুমার চোখ দু'টো চকচক করে উঠলো আনন্দে।

❑

ঝুমা বেরিয়ে আসতেই একটা ঝোপের আড়াল থেকে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো আর্ম, দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরলো ঝুমার একখানা হাত।

ঝুমা চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ চেপে ধরলো আর্ম, ঝুমার কণ্ঠ থেমে গেলো মুহূর্তে।

ঝুমার কণ্ঠস্বর ডাকবাংলো কাঁচের শার্শী ভেদ করে বনহুরের কানে পৌঁছায় না। বনহুর নিশ্চিন্ত মনে সংবাদপত্র পাঠ করে চলে।

ওদিকে তখন আর্ম ঝুমাকে টেনে নিয়ে চলে অন্য দিকে। মুখে তার রুমাল গুঁজে দিয়েছে মজবুত করে, তাই সে আর কোনো শব্দ করতে পারে না।

কক্ষের অভ্যন্তরে এক পাশে একটা কাঠের আলমারী ছিলো। বহুদিনের পুরোন আলমারীটা। কাজেই এ আলমারী কেউ ব্যবহার করে না। আর্ম ঝুমাকে টেনে এনে ঐ আলমারীর মধ্যে বন্দী করে ফেললো, তারপর একটা তালা বন্ধ করে দিলো আলমারীর গায়ে। বেশিক্ষণ বিলম্ব করার সাহস আর্মের ছিলো না। সে ঝুমাকে পুরোন আলমারীটার মধ্যে আটকে রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় বললো—এবার দেখবো কেমন করে বাবুকে তুই বাঁচাস।

আর্ম চলে গেলো।

ঝুমার ক্ষীণকণ্ঠে বেরিয়ে এলো বাবু...বাবু...বাঁচা.... বাবু...বাঁচা......

আর্ম ঝুমাকে আলমারীর মধ্যে আটকে ফেলতেই—ঝুমার হাত মুক্ত হয়েছিলো, সে মুখের ভিতর থেকে রুমালখানা টেনে বের করে ফেললো। প্রাণপণে ঝুমা চিৎকার করে ডাকলো—বাবু......বাবু......বাবু, বাঁচা......বাবু বাঁচা........

কিন্তু আলমারীর মধ্যে থেকে শব্দ বাইরে শোনা গেলো না।

ঝুমার কণ্ঠ এক সময় থেমে গেলো।

বিহাগী আর খুঁজে পায় না তার প্রিয় কন্যা ঝুমাকে। মা-মরা মেয়েটিকে বুকে করে বেঁচে ছিলো বিহাগী কিন্তু দু'দিন হলো, আর তাকে খুঁজে পায় না। কোথায় গেলো তার ঝুমা, সে জানে না। পাড়া প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে জিজ্ঞাসা করে বেড়ায় বিহাগী—আমার ঝুমাকে তোরা দেখেছিস?

সবাই বলে—না তোর ঝুমা তো এদিকে আসেনি, তাকে আমরা কেউ দেখিনি।

তবে ঝুমা গেলো কোথায়?

বিহাগী মালী ছুটলো ডাকবাংলো অভিমুখে। বনহুর তখন বাইরে বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছিলো। বিহাগী এসে দাঁড়ায় বাবু.........

বাবুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠে বিহাগীর গলা। বাবুর খাবারে বিষ দিয়েছিলো তবু বাবু মরেনি। চায়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিলো তবু বাবু মরলো না। তাজ্জব হয়ে গেছে বিহাগী! বাবু এত বিষ খেয়েও হজম করে ফেললো। বাবু কি তবে যাদু জানে.........

বিহাগীকে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বনহুর জিজ্ঞাস করে—কিছু বলবে বিহাগী?

হাঁ বাবু।

বলো?

বাবু আজ দু'দিন হলো ঝুমাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ঝুমা এখানে এসেছিলো বাবু?

বনহুরের মনে পড়লো সেদিনের কথা, ঝুমা তাকে সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছিলো। কেউ তাকে চায়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খেতে দিয়েছিলো, ঝুমা সে চা ফেলে দিয়েছিলো জানালা দিয়ে বাইরে। তার পূর্বে একদিন খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়েছিল, সে খাবারও ঝুমা তাকে খেতে দেয়নি। সেদিনও ঝুমা তাকে রক্ষা করেছে। বনহুর খুশি হয়ে তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়েছিলো তার নিজের আঙ্গুলের আংটি। ঝুমার চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো, তারপর সে বেরিয়ে গিয়েছিলো তার কক্ষ থেকে। ঝুমা সেদিনের পর থেকে আর আসেনি। আজ দু'দিন কেটে গেছে ঝুমা আসেনি। বনহুরের মনে পড়েছে ঝুমার কথা কেন সে আসে না, হয়তো কাজে সে ব্যস্ত আছে। ওর বাবা বিহাগী রোজ কাজে আসে, তাকে জিজ্ঞাসা করবে মনে

করেছে বনহুর কিন্তু জিজ্ঞাসা করেনি। আজ বিহাগী তাকেই এসেছে জিজ্ঞাসা করতে। ঝুমা তাহলে সেই দিন বাড়ি ফিরে যায়নি। বনহুর যখন এসব কথা ভাবছে তখন বিহাগী বলে উঠে। বাবু ঝুমা সেই যে দু'দিন আগে বাড়ি থেকে এসেছে আর সে বাড়ি ফিরে যায়নি......কথাটা বলতে বলতে গামছায় চোখ মোছে বিহাগী।

বনহুর বললো—হাঁ এসেছিলো ঝুমা।

বাবু!

কিছুক্ষণ সে এখানে ছিলো, তারপর সে চলে গিয়েছিলো ডাকবাংলো থেকে।

বাবু মিথ্যে কথা—সে যায়নি......

বিহাগী মিথ্যে নয় সত্যি।

বাবু আমি ঝুমার জন্য সারাদিন বসেছিলাম, তবু সে যায়নি।

তবে সে গেলো কোথায়?

হাঁ বাবু ঐ এক কথা আমারও, মা-ঝুমা আমার কোথায় হারিয়ে গেলো। বাবু আজ দু'দিন হলো আমি তাকে জঙ্গলে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি তবু তার চিহ্ন পাইনি।

বনহুর অন্যমনস্ক ভাবে কিছু চিন্তা করে, তারপর বিহাগীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—বিহাগী তুমি কেঁদোনা, আমি কথা দিলাম তোমার মেয়েকে খুঁজে বের করে তোমার হাতে তুলে দেবো।

বাবু!

হাঁ বিহাগী তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

বাবু......বিহাগী চোখ মোছে। মনে পড়ে এই বাবুটিকে সে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে যাচ্ছিলো, কত মহৎ প্রাণ তার।

বিহাগী চলে যায়।

বনহুর একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। একরাশ চিন্তা জটলা পাকায় তার মাথার মধ্যে। ঝুমা বেরিয়ে গেলো তার কক্ষ থেকে, তারপর সে গেলো কোথায়।

পায়চারী করে চলে বনহুর।

রহমান বেরিয়ে গেছে কাজে। পুলিশ মহল অশ্বারোহীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কে সেই অশ্বারোহী, যার অশ্বের খুরের শব্দ ফাংহাবাসীর মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে—পুলিশ মহলকে সজাগ করে তুলেছে।

বনহুরের হাসি পায়, পুলিশ মহল আসল এবং নকল চেনেনা। তারা অনেক সময় আসল দোষীকে ছেড়ে নির্দোষী ব্যক্তির পিছু ধাওয়া করে। যেমন ফাংহায় কারা অপরাধী তাদের সন্ধান না করে রাতের অন্ধকারে কোনো অশ্বারোহীর অশ্ব-পদশব্দ শোনা গেলো তারই সন্ধান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই।

রহমান তাই গোপনে খোঁজ নিয়ে চলেছে, কোনো পুলিশ মহল কখন তার সর্দারের সন্ধান করছে এবং কিভাবে তারা অগ্রসর হচ্ছে।

বনহুর যখন ঝুমার কথা নিয়ে ভাবছে তখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে রহমান।

বনহুরকে দেখেই কুর্ণিশ জানিয়ে বললো রহমান—সর্দার।

বনহুর ফিরে তাকাতেই ব্যস্তভাবে বলে রহমান—পুলিশ অশ্ব খুরের সন্ধান নিয়ে ডাকবাংলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা অচিরে এখানে এসে পড়বে।

বনহুরের ভ্রুকুঞ্চিত হলো, বললো সে—পুলিশ মহল তা হলে অশ্ব খুরের দাগ ধরে এদিকে আসছে?

হাঁ সর্দার, শীঘ্র আমাদের সরে পড়তে হবে।

কিন্তু ডাকবাংলো ছেড়ে আমার যাওয়া চলবেনা রহমান। তুমি জানো না নতুন এক সমস্যা এসেছে, ঝুমা হারিয়ে গেছে এই ডাকবাংলো থেকে।

ঝুমা বিহাগী মালীর মেয়ে?

হাঁ রহমান! ঝুমার উপকারের কথা কোনোদিনই ভুলবো না। রহমান তুমি জানোনা সে আমাকে একবার নয় দু'বার মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে। সংক্ষেপে ঝুমার উপকারের কথা বললো, সে কেমন করে বার বার তাকে বিষ থেকে রক্ষা করেছে।

রহমানের চক্ষুস্থির, সর্দারকে সে নিপুন দৃষ্টির মধ্যে রেখে পাহারা দিয়ে এসেছে। কিন্তু এমন কঠিন মৃত্যুর মুখ থেকে সর্দার রক্ষা পেয়েছে, ভাবতেই তার বিস্ময় লাগছে। বেশিক্ষণ ভাববার সময়ও নেই। পুলিশ মহল অশ্বপদ চিহ্ন লক্ষ্য করে এগুচ্ছে। আর কিছু সময়ের মধ্যেই তারা ডাকবাংলোর নিকটে এসে পড়বে।

রহমান বললো—সর্দার এখন ভাববার সময় নেই, যা হয় তাড়াতাড়ি করতে হবে।

বনহুর বললো—তুমি আপাততঃ বাংলো ছেড়ে চলে যাও।

আর আপনি?

আমার জন্য ভেবোনা, যাও রহমান।

রহমান বেরিয়ে গেলো।

ওদিকে সন্ধানী পুলিশ বাহিনী অশ্বপদ-চিহ্ন লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। অশ্বপদ-চিহ্ন ক্রমান্বয়ে ডাকবাংলোর দিকে এগুচ্ছে।

পুলিশ প্রধান পুলিশ বাহিনীকে ডাকবাংলো ঘিরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাহিনী পুলিশ প্রধানের নির্দেশ পালন করলো, ঘেরাও করে ফেললো ফাংহা ডাকবাংলো। পুলিশ প্রধান প্রবেশ করলো ডাকবাংলোর অভ্যন্তরে। তার পিছনে কয়েকজন পুলিশ।

কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতেই দেখলো—একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বসে আছে সোফায়, তার সম্মুখে কিছু ধর্মীয় পুস্তক। মনোযোগ সহকারে একটি ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করে চলেছেন বৃদ্ধ।

পুলিশ প্রধান কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, সম্মুখে সৌম্য সুন্দর এক জ্যোতিষী মূর্তি। ললাটে তার চন্দনের আল্পনা।

পুলিশ প্রধান মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালো, শ্রদ্ধায় নত হয়ে উঠলো তাঁর মাথাটা। পুলিশ প্রধান ভাবতেও পারলেন না এই কক্ষে কোনো অসৎ ব্যক্তি আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

পুলিশ প্রধানের পিছনে আরও কয়েকজন পুলিশ সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে ছিলো। তারা পুলিশ অধিনায়কের আচরণে বিস্মিত হয়ে গেলো। তারাও এক পা এগুবার সাহস পাচ্ছিলো না।

চোখ মেললেন বৃদ্ধ জ্যোতিষী, অর্দ্ধ মেলিত আঁখি ধীর শান্ত সে দৃষ্টি, বললেন বৃদ্ধ জ্যোতিষী—বৎস তোমরা যে কারণে এখানে আসিয়াছো আমি বুঝিতে পারিয়াছি। অপরাধ তোমাদের নয় অপরাধ আমারই, কারণ দেবদূতকে আমিই বলিয়াছিলাম সে যেন অশ্বযোগে আমার বাংলোয় আগমন করে।

পুলিশ প্রধান বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন—কে আপনি? আর দেবদূতই বা কে? আমি আপনার কথা বুঝতে পারছিনা।

ঠিক ঐ একই প্রশ্ন জাগিতো আমার মনে, যদি না আমি গণনা শাস্ত্রে দীক্ষা লাভ করিতাম। প্রশ্ন জাগিত, কে আপনারা এবং কেনই বা এই নির্জন বাংলোর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু সে প্রশ্ন আমাকে আর বিচলিত করিতে সক্ষম নহে। আসুন ইন্সপেক্টার সাহেব—আসন গ্রহণ করুন।

পুলিশ প্রধান থ' হয়ে গেছেন, তার মুখ দিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ হচ্ছে না। তিনি যন্ত্র চালিত পুতুলের মত আসন গ্রহণ করলেন। যে সব পুলিশ বাহিনী তাকে অনুসরণ করে কক্ষে প্রবেশ করেছিলো—তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পুলিশ প্রধান আসনে উপবেশন পূর্বক কোমল কণ্ঠে বললেন—আপনার পরিচয় আমরা জানি না, আর জানি না বলেই আমরা এখানে এসেছি......

জানি, আপনারা মিথ্যা এক ছলনার পিছনে ধাওয়া করিয়া এখানে আসিয়াছেন। অশ্বারোহীর অশ্বের পদচিহ্ন আপনাদিগকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে। বলুন ইন্সপেক্টার, সত্যি কিনা?

পুলিশ প্রধান বললেন—হাঁ, জ্যোতিষী বাবাজী আপনার কথা সত্য, আমরা অশ্বপদচিহ্ন লক্ষ্য করেই এখানে এসেছি। আমরা......

হাঁ, আপনাদের ভুল পথে পরিচালিত করা হইয়াছে। আপনারা যে সন্দেহ পোষণ করিতেছেন, তাহা সত্য নহে। যে অশ্বপদ শব্দ ফাংহাবাসী গভীর রাত্রিতে শ্রবণ করিয়াছে, তাহা আমার দেবদূতের অশ্বপদশব্দ। গভীর রাত্রিকালে দেবদূত শহরে-বন্দরে-নগরে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

দেবদূত!

হাঁ, সে এক অশরীরী আত্মা......একটু থেমে বললেন বৃদ্ধ জ্যোতিষী—আপনারা নিঃসন্দেহে ফিরিয়া যাউন। বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

চোখ মুদিলেন জ্যোতিষী।

পুলিশ প্রধান এবার দলবল সহ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁর বুকের মধ্যে আলোড়ন হচ্ছিলো কারণ তিনি জ্যোতিষীগণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস করেন।

❑

গভীর রাতে এলো রহমান।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল বনহুর।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—রহমান—সর্দার, পুলিশ বাহিনীসহ পুলিশ ইন্সপেক্টর ফিরে গেছেন সত্য, কিন্তু একদল কু'চক্রিদল আমাদের ডাকবাংলোর উপর কড়া পাহারা রেখেছে, অবশ্য এরা আর্মের লোক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি জানি আর্ম আমাদের পিছু লেগে রয়েছে। এই ডাকবাংলোয় আমরা আর বেশিদিন থাকতে চাই না, তবে ঝুমা কোথায় গেলো যতদিন তার সন্ধান না পাওয়া গেছে ততদিন আমাকে এই ডাকবাংলোতেই থাকতে হবে। রহমান তোমাকে এক কাজ করতে হবে।

বলুন সর্দার?

পুলিশ যখন আমাদের পিছু লেগেছে তখন আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। যে কোন মুহূর্তে পুলিশ পুনরায় এসে পড়তে পারে। কাজেই তোমাকে সর্বক্ষণ এই ডাকবাংলোয় থাকতে হবে জ্যোতিষীর বেশে।

সর্দার।

হাঁ, আমার জ্যোতিষী ড্রেস তোমাকেই পরতে হবে। আমি চুপচাপ এখানে থাকতে পারছিনা কারণ নীল সাগরের তলে কোথায় আছে সেই স্বর্ণগুহা সেটা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

আচ্ছা সর্দার আপনার নির্দেশ মতই আমি কাজ করবো।

বনহুর রহমানকে নিয়ে পাশের ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করলো। তাকে নিজের হাতে জ্যোতিষীর সাজে সাজালো বনহুর। আয়নার পাশে দাঁড় করিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখলো, সত্যি ঠিক তারই মত মানিয়েছে।

বললো বনহুর—চমৎকার, এবার ঠিক চলবে।

বনহুর শিখিয়ে দিলো, পুলিশের লোক এলে তাদের সঙ্গে কিভাবে আলাপ আলোচনা করবে। সে যে ভাবে যে সব কথা বার্তা বলেছিলো ঠিক তেমনি ভাবে বলতে হবে।

রহমান বনহুরের দক্ষ সহকারী তাকে বেশি করে শেখাতে হবে না, কেমন ভাবে চলতে হবে জানে সে।

বনহুরের জন্য অদূরে কোনো এক গোপন স্থানে অশ্ব অপেক্ষা করছিলো, বনহুর রহমানের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

গভীর রাত।

আবার ফাংহার পাথুরে মাটিতে অশ্বপদ শব্দের প্রতিধ্বনি জাগলো। ফাংহা অধিবাসীরা শিউরে উঠলো, নতুন কোনো বিপদের সংকেত ধ্বনি নয়তো এটা।

পুলিশ মহল এবার ঘাবড়ালো না, কারণ তারা জানে এটা দেবদূতের অশ্বখুরের শব্দ।

আর্ম কিন্তু নিশ্চুপ ছিলো না, সে পুলিশ প্রধানের কাছে গিয়ে হাজির হলো, এবং জানালো, অশ্বপদশব্দ সম্বন্ধে গভীরভাবে সন্ধান করুন, নিশ্চয়ই এটা কোনো শয়তান লোকের চক্রান্ত।

কিন্তু পুলিশ মহল আর্মের কথায় কান দিলো না। বরং আর্মকে তারা অপমান করে তাড়িয়ে দিলো।

আর্ম আরও ক্রুদ্ধ হলো, সে বিমুখ হয়ে চলে গেলো সেখান হতে।

সোজা সে হিরন্ময়ের কাছে এসে হাজির হলো। কে এই অশ্বারোহী, এই নিয়ে গভীরভাবে পরামর্শ চললো।

আর্ম গলায় জোর দিয়ে বললো—আমাদের গোপন বৈঠকে যে ব্যক্তি ছোরা নিক্ষেপ করেছে, সে অন্য কেউ নয় ঐ অশ্বারোহী। কারণ আমাদের গোপন বৈঠকের অদূরে কাদায় অশ্বপদ চিহ্ন দেখা গেছে।

হিরন্ময় নিজেও এই অশ্বপদ চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলো। তাই সে মেনে নিলো, বললো—হাঁ, আর্ম তোমার কথা মিথ্যা নয়, অশ্বারোহীই আমাদের শত্রু এবং ছোরা সেই নিক্ষেপ করেছিলো। কিন্তু কে এই অশ্বারোহী আমি জানি।

আর্ম বিস্মিত হলো, বললো—স্যার আপনি জানেন তবু নিশ্চুপ আছেন? বলুন, কে সে দুষ্টো লোক, যে আমাদের পিছু নিয়েছে।

হিরন্ময় বললো—আর্ম আমি নিজেও তার পিছু নিয়েছি। সে যেমন আমার পিছু নিয়েছে......একটু থেমে বললো হিরন্ময়—ফাংহা ছেড়ে আমি সরে পড়তাম কিন্তু যতদিন আংহাবারীর ঐশ্বর্য আমি আত্মসাৎ করতে না পেরেছি ততদিন আমাকে ফাংহায় অবস্থান করতেই হবে। জানো আর্ম, শুধু নিজেদের ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি জাহাজে আস্তানা নিয়েছি, যেন কেউ আমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে না পারে।

স্যার।

বলো আর্ম?

এখন তা হলে আমার কি কাজ আদেশ করুন?

মিস মালাকে কৌশলে হাত করতে হবে, এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে নানা ভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যেন আংহাবারীর ঐশ্বর্য আমাদের হাত ছাড়া না হয়।

বলুন কি ভাবে আমি অগ্রসর হতে পারি?

মিস রীণা আমাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করবে। হিরন্ময় কথাটা বলে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ সিগারেট পান করলো—এসো তোমার সঙ্গে গোপনে আলোচনা আছে।

আর্ম বললো—চলুন স্যার।

মোটর বোটে চেপে বসেলো হিরন্ময় আর আর্ম। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে মোটর বোটখানা এগিয়ে চললো। হিরন্ময় নিজে মোটর বোট চালনা করে চলেছে তার পাশে বসে আছে আর্ম।

আর্মের মাথায় ক্যাপ, পরনে ঢিলা প্যান্ট এবং শার্ট! পায়ে বুট জুতা। দেহের রং লালচে এমন কি চোখের রং ওর লাল।

হিরন্ময় খাটি বাঙ্গালি, তার বাড়ি বিদেশে, ভাল ইংরাজি জানে, তাই তার দলের সবার সঙ্গে সে সচ্ছভাবে কথা-বার্তা বলতে পারে।

আর্মের সঙ্গে মিঃ হিরন্ময় ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলছিলো।

আর্ম বললো—স্যার আপনার সঙ্গে অনেক দিন ব্যবসা করছি কিন্তু আজও আপনি আমাকে প্রথম সহকারী দলে গ্রহণ করলেন না।

হিরন্ময়ের মুখে একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সে আর্মের কথার কোনো জবাব না দিয়ে তাকিয়ে আছে সম্মুখে সমুদ্রের ফেন নীভ জলরাশির দিকে।

সমুদ্রের ঘোলাটে জল রাশির মতই অপরিস্কার তার মনটা। নানা রকম কুৎসিত চিন্তায় আচ্ছন্ন তার হৃদয়। বললো হিরন্ময়—শুধু তুমি নও আর্ম তোমার মত আরও অনেক সহকারী আছে—যাদের আমি আজও প্রথম সারীর সহকারী হিসেবে গ্রহণ করতে পারিনি।

তবে কি চিরদিন......

না, আরও কিছু সময় আছে তারপর তোমরা হবে আমার বিশ্বস্ত অনুচর।

আর্ম খুশি হতে পারলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যে হিরন্ময়ের মোটর বোট এসে পৌছে গেলো তার জাহাজের পাশে।

জাহাজের পাশে মোটর বোটখানা ভিড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের গায়ে একটি দরজা বেরিয়ে এলো। হিরন্ময় এবং আর্ম সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো জাহাজের ভিতরে।

ঠিক যেন একটা সুড়ঙ্গ পথ।

ঐ পথ বেয়ে উপরে উঠে গেলো হিরন্ময় আর আর্ম।

জাহাজের উপরে এসে পৌছতেই হিরন্ময়ের সহকারীগণ ঘিরে দাঁড়ালো তাকে।

ডেকে দাঁড়িয়ে হিরন্ময় সহকারীদের নির্দেশ দিলো, কে কোথায় কোন কাজে যাবে এবং কিভাবে কাজ করবে।

হিরন্ময়ের প্রধান সহকারী কর্ণেল হিপ্‌টনকে লক্ষ্য করে বললো হিরন্ময়—হিপটন তোমার জাহাজ "মুঙ্গের" কি প্রস্তুত?

হাঁ স্যার প্রস্তুত।

মাল ঠিকভাবে তুলে নিয়েছো?

হাঁ স্যার, কয়লার তলায় কক্ষ দুটো বসিয়ে নিয়েছি। কোনো পুলিশ গোয়েন্দা এর সন্ধান পাবে না।

খুব সাবধানে যাবে। সন্ধানী পুলিশ, গোয়েন্দার জাহাজ, যদি সন্ধান চালায় তোমরা ঘাবড়াবে না। নীল সাগরের গোপন পথ তোমাদের জানা আছে তো?

আছে স্যার।

যাও তবে।

হিপটন চলে যায়।

অপর একজনকে লক্ষ্য করে বলে হিরন্ময়—তুমি যাবে স্পীডবোট নিয়ে। আংহাবারীর কন্যা মালার ভাবী জামাতা কোন তারিখে বিদেশ থেকে ফিরে আসবে—সেই সন্ধান নিয়ে আসবে। আংহাবারী ছাড়া তার ভাবী জামাতাকে কেউ চেনে না এমন কি মিস মালাও তাকে দেখেনি কোনোদিন।

আর্ম বললো—মিস মালা ও তার ভাবী স্বামীকে দেখেনি?

না, কারণ তার ভাবী স্বামী বিদেশী। আংহাবারী যখন লণ্ডন ছিলেন তখন তিনি তার বন্ধুর ছেলে মাহরুফকে পছন্দ করেন এবং তার সঙ্গে একমাত্র কন্যা মালাও বিয়ে দেবেন কথাবার্তা পাকা করেন।

তা হলে মালাও দেখেনি মাহরুফকে আর মাহরুফও দেখেনি মালাকে? বললো আর্ম।

হিরন্ময় বললো—এ কারণেই আমি আংহাবারীর বিপুল অর্থ এবং সোনা নিজেদের আয়ত্তে আনাবার নতুন এক পথ আবিষ্কার করেছি। যাও মাংসু আর বিলম্ব করো না। তুমি সংবাদ নিয়ে এলে তারপর আমার কাজ শুরু হবে।

মাংসু চলে যায়।

এবার হিরন্ময় বললো—আর্ম, চলো ভিতরে গিয়ে বসে তোমার সঙ্গে আলাপ করি।

হিরন্ময় আর্ম এবং তার আরও কয়েকজন অনুচরসহ ক্যাবিনে এসে বসলো। জাহাজখানা ফাংহা সাগরের মাঝামাঝি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক পাশে হিংগু পাহাড়, অপরদিকে নীল সাগরের মোহনা। এমন জায়গায় হিরন্ময় তার জাহাজখানা রেখেছে যেখান দিয়ে কোন জাহাজ চলাচল করে না। লোকচক্ষুর দৃষ্টি এড়িয়ে গোপন ব্যবসা চালিয়ে চলেছে হিরন্ময়।

জাহাজের নির্ভৃত ক্যাবিনে গিয়ে বসলো, হিরন্ময় দলবলসহ। আর্ম তার সম্মুখে একটি চেয়ারে বসলো।

ততক্ষণে মাংসু একখানা স্পীডবোট নিয়ে রওয়ানা দিয়েছে ফাংহা শহর অভিমুখে। সে আংহাবারীর কন্যা মিস মালার ভাবী স্বামীর সন্ধান নিয়ে ফাংহা এরোড্রামে পৌঁছবে।

প্রথম অনুচর বিজয়বিহারী রওয়ানা দিয়েছে তার কয়লা বোঝাই জাহাজ নিয়ে। কয়লার নিচে আছে কোটি কোটি টাকার সোনা। বিজয়বিহারী পাকা ধূর্ত ব্যবসায়ী। বহুদিন থেকে সে চোরাকারবার করে আসছে। দেশ-বিদেশ থেকে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করাই ছিলো তার কাজ। অবশ্য প্রকাশ্য ব্যবসা তার কয়লার। নিচে চলতো তার গোপন কারবার। এমন কি শিশুখাদ্য নিয়েও বিজয় বিহারী বহুবার কয়লা চাপা দিয়ে দেশের বাইরে চালান দিয়েছে। এবার চলেছে সে কয়লার নিচে সোনা নিয়ে।

হিরন্ময় এখন নিশ্চিন্ত, জাহাজে যে সোনা জমা হয়েছিলো সব সে আজ নীল সাগরের তলে গোপন আস্তানায় পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। বিজয়বিহারী তার বিশ্বস্ত অনুচর। বিজয়বিহারী নাম তার ছদ্মনাম। প্রকাশ্য তাকে কর্ণেল হিপটন বলেই ডাকে হিরন্ময়। হয়তো হিরন্ময়-এরও কোনো একটা গোপন নাম আছে যে নাম সে গোপনে করে ফাংহায় হিরন্ময় নামে ব্যবসা চালিয়ে চলেছে। তবে সবাই হিরন্ময়কে এ নামেই জানে।

ক্যাবিনে বসে বললো হিরন্ময়—আর্ম, তোমাকে যে-কাজ দেবো তা যেমন সহজ তেমনি কঠিন। তোমাকে পারতেই হবে বুঝলে?

বলুন স্যার কি কাজ?

আমি জানতে পেরেছি আংহাবারীর জামাতা অচিরেই ফিরে আসছে। এলেই বিয়ে হবে মিস মালার সঙ্গে। কিন্তু এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে......

বিয়ে বন্ধ করতে হবে?

হাঁ। তবে বিয়ে হবেই......

তার মানে? বললো আর্ম।

বিয়ে হবে কিন্তু মাহরুফের সঙ্গে নয়।

স্যার, তবে কার সঙ্গে বিয়ে হবে?

বিয়ে হবে অপর এক যুবকের সঙ্গে। শোন আর্ম, তোমরা সবাই শোন, আমি নতুন এক পথে অগ্রসর হচ্ছি। আর্ম অবশ্য তোমাকেই এ কাজ করতে হবে।

বলুন স্যার?

এমন এক যুবককে খুঁজে বের করো যাকে আমরা মাহরুফ সাজাতে পারবো।

হিরন্ময়ের কথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সবাই। বলে চলেছে হিরন্ময়—আসল মাহরুফ ফাংহা বিমান বন্দরে অবতরণ করার পর-পরই তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তারই স্থানে আমাদের সংগ্রহ করা যুবকটিকে স্থাপন করতে হবে। মালার সঙ্গে পরিচয় ঘটার পূর্বেই আসল মাহরুফকে সরাতে হবে এ কথা কেউ যেন ভুলে যেওনা।

আর্ম বলে উঠলো—মিস মালা ছাড়াও তার বাবা আংহাবারী থাকবে বিমান বন্দরে, তাঁর চোখে কি করে ধুলো দেবেন স্যার?

আর্ম সে কাজ আমিই করবো। একটু চুপ করে ভেবে নিলো হিরন্ময় তারপর বললো—আংহাবারীকে সর্বপ্রথম সরাতে হবে।

সরাতে হবে?

হাঁ, একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, না হলে আমাদের সব অভিসন্ধি নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের বশীভূত যুবককে মাহরুফ সাজিয়ে তারই দ্বারা মিস মালাকে আয়ত্বে আনতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে চলে আসবে আংহাবারীর সমস্ত ধন সম্পদ এবং প্রচুর সোনা। সব কাজ কৌশলে সমাধা করতে হবে। মাহরুফ বিমান বন্দরে পৌছবার পূর্বেই আংহাবারীকে......বুঝেছো তোমরা?

হাঁ, বুঝেছি।

বলো, কে এই কাজ করতে সক্ষম হবে?

সবাই এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে নিলো।

আর্ম বললো—যদি আমাকে মোটা অংক দেন তাহলে আমিই এ কাজ সমাধা করবো।

হিরন্ময় বললেন—বেশ তাতেই রাজি আছি। কিন্তু মনে রেখো, যদি এ কাজে অসমর্থ হও তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না।

আর্ম বললো—আমি কারো ক্ষমার ভিখারি নই স্যার।

যাও আর্ম তুমি আংহাবারীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত হও।

আর্ম হাতে হাত মিলালো হিরন্ময়ের সঙ্গে। তারপর বললো—স্যার আমি তাকে কি ভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবো তার বর্ণনা একটু শুনুন!

বলো আর্ম?

শুনুন, আমি প্রথমে তার বাড়িতে ড্রাইভারের কাজ নেবো। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে গাড়িসহ নিক্ষেপ করবো তাকে হিলড্রগের নিচে।

হিলড্রগ ফাংহার সবচেয়ে উঁচু এবং দুর্গম গিরিপথ। এই পথে ফাংহার যানবাহন চলাচল কালে অত্যন্ত ভীত-আতঙ্কিতভাবে চালক গাড়ি চালনা করে থাকে। আর্ম এই হিলড্রগ থেকেই আংহাবরীকে নিক্ষেপ করে হত্যা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

কিন্তু এ কথায় খুশি হতে পারে না হিরন্ময়। সে বলে উঠলো—না, হিলড্রগ থেকে নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করা চলবে না, এতে অসুবিধা আছে; বরং তুমি এক কাজ করো।

বলুন স্যার?

তুমি বরং আংহাবারীকে কৌশলে নিয়ে এসো আমার জাহাজে। এখানে তাকে কোনো ব্যবসা ব্যাপারে আলোচনার জন্য নিয়ে আসবে। আলোচনা চলবে জাহাজের ডেকে। যখন কথাবার্তা শেষ হয়ে আসবে, তখন পিছন থেকে আংহাবারীকে টেনে ফেলে দিবে সমুদ্রগর্ভে। বাস্, তাহলে কেউ জানবে না, কোথায় গেলেন আংহাবারী......সমুদ্রের গহ্বরে তলিয়ে যাবে ফাংহার ধন কুবের। হাঃ হাঃ হাঃ আর্ম তুমি এইভাবে কাজ করবে বুঝলে?

বুঝেছি স্যার। বললো আর্ম।

আরও কিছুক্ষণ চললো হিরন্ময়ের গোপন মিটিং। তারপর বিদায় গ্রহণ করলো আর্ম।

এবার হিরন্ময় নয় আর্ম এসে বসলো স্পীডবোটে। চালক পূর্ব হতেই স্পীডবোটে বসেছিলো, আর্ম এসে বসতেই স্পীডবোট চলতে শুরু করলো।

❑

গভীর রাতে ফিরে এলো বনহুর ডাকবাংলোয়। দরজায় মৃদু টোকা দিতেই রহমান দরজা খুলে দিলো। বনহুর রহমানকে জ্যোতিষীর বেশে দেখে খুশি হলো, কারণ তাকে ঐ বেশেই বনহুর থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলো।

রহমান নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর শরীর থেকে জামাটা খুলে বিছানার উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বসে পড়লো, তারপর বললো—রহমান যাত্রা শুভছিলো।

সর্দার!

হাঁ।

সর্দার আপনি ঠিক্ জায়গায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন তো?

একেবারে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। রহমান অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে?

বলুন সর্দার। কিন্তু তার পূর্বে আপনি খেয়ে নিন। টেবিলে আপনার খাবার সাজিয়ে রেখেছি।

বনহুর খাবার টেবিলে এসে বসলো।

রহমান এসে প্রতিটি খাবার থেকে একটু একটু করে খেয়ে নিলো, তারপর বললো—এবার খেয়ে নিন সর্দার।

রহমানের কাজ দেখে হাসলো বনহুর, বললো—মৃত্যু যখন আসবে তখন কেউ রোধ করতে পারবে না রহমান। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেই হবে! খেতে শুরু করলো বনহুর।

খেতে খেতে বললো—বসো কথা আছে।

রহমান পাশের আসনে বসলো—প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি তুলে ধরলো সে সর্দারের মুখে।

বনহুর কিছুটা খাবার খেয়ে নিয়ে বললো—আমি আর্মকে অনুসরণ করে ঠিক্ জায়গায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। ইচ্ছা করলে হিরন্ময়ের নীল সাগর তলের ঘাটির সন্ধান আজই করে আসতে পারতাম কিন্তু হলোনা। রহমান, আংহাবারী বলে এক ধন কুবেরু আছেন। শুধু ধন-সম্পদ নয়, তার আছে প্রচুর সোনা। সেই ঐশ্বর্য আর সোনার লোভে আংহাবারীকে হত্যার ষড়যন্ত্র

চলেছে। একটু থেমে বললো বনহুর—শুধু তাই নয়, আংহাবারীর ধন-সম্পদ হস্তগত করার জন্য তার কন্যা মিস মালার ভাবী স্বামীকেও সরিয়ে ফেলার চক্রান্ত চলেছে, এবং এ সব চক্রান্তকারী একই ব্যক্তি, যিনি সীমান্তের ওপর থেকে এসে সাধুতার মুখোস পরে এদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিদিগকে নাচের পুতুল বানিয়ে দেশের সম্পদ লুটে নিচ্ছে।

সর্দার একি সেই মহামান্য হিরন্ময়?

হাঁ রহমান, বন্ধু রাষ্ট্রের একজন মহানায়ক হিরন্ময়। শিয়ালের মত ধূর্ত আর শার্দ্দুলের মত নিষ্ঠুর। ব্যবসার খাতিরে এই ব্যক্তি শত শত নর হত্যা করে চলেছে। এ দেশের স্বনাম ধন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে এমন সুমধুর ব্যবহার করে থাকেন এই কুচক্রি যার জন্য তাকে কেউ অসৎ ব্যক্তি মনে করতেই পারেন না, তাছাড়া ইনি বন্ধু রাষ্ট্রের একজন অধিনায়ক।

সর্দার।

হাঁ, আমি আসল কথা ভুলেই গিয়েছি। যেমন করে হোক আংহাবারীও তার ভাবী জামাতাকে রক্ষা করতেই হবে। তা ছাড়াও রক্ষা করতে হবে আংহাবারীর ধন-সম্পদ।

সর্দার আপনি বললেন আংহাবারীর কন্যা মিস মালার ভাবী স্বামীকে সরিয়ে ফেলার চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। আমি ঠিক্ বুঝতে পারছি না সর্দার আংহাবারীর ভাবী জামাতাকে সরিয়ে ফেলে চক্রান্তকারীর কি লাভ হবে।

সে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র! থামলো বনহুর, খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালো। এসে বসলো—ভাবী জামাতাকে সবার অগোচরে সরিয়ে ফেলে— চক্রান্তকারী নিজেদের নির্বাচিত কোনো এক যুবককে ভাবী জামাতা সাজিয়ে মালাকে কৌশলে হাতের মুঠায় নিয়ে আসবে তারপর আংহাবারীর ঐশ্বর্য আত্নসাৎ করবে।

সর্দার, এ একটা নতুন কারসাজি দেখছি।

হাঁ, নতুন কারসাজিই বটে। বনহুর কথাটা বলে গলার স্বর খাটো করে নিয়ে বললো—রহমান চক্রান্তকারীর সব চক্রান্ত বানচাল করতে হবে। আর্ম এসেছে আংহাবারীর বাস ভবনে তাকে কৌশলে নিয়ে যাবে হিরন্ময়ের জাহাজে। হাত ঘড়ির দিকে তাকায় বনহুর—আমি বিলম্ব করতে পারছি না।

সর্দার, আপনি এখনই বের হবেন?

হাঁ রহমান আজ আমার বিশ্রাম হবে না। একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে কয়েক মুখ ধুঁয়ো উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো—ঝুমা কোথায়

জানি না। ঝুমাকে খুঁজে বরে করতেই হবে। ঝুমাকে না পেলে ওর বৃদ্ধ পিতা বাঁচবে না। রহমান আমি দু'টো সমস্যায় পড়েছি, একটি হলো ঝুমাকে খুঁজে বের করা আর একটা হলো আংহাবারীর জীবন ও তার ঐশ্বর্য রক্ষা করা......জানি না এ দুটো সমস্যা উদ্ধার করতে পারবো কি না।

সর্দার, আমার মনে হয় ঝুমাকে শয়তান আর্ম সরিয়েছে।

হাঁ, আমারও তাই মনে হয়। ফুলের মত নিষ্পাপ ঝুমাকে ঐ নর পশু......কথা শেষ না করে বনহুর দাঁতে দাঁত পিষলো।

রহমান বললো—আর্ম কোনো গোপন স্থানে তাকে আটকে রেখেছে.........

শুধু আটকেই রাখেনি, সে তার উপর চালাচ্ছে অমানুষিক অত্যাচার। ঐ পাপিষ্টকে আমি.........

সর্দার, ঝুমাকে উদ্ধার করাই আমাদের প্রথম কাজ। বেচারী সাঁওতাল কন্যা ঝুমা বড় ভাল মেয়ে ছিলো।

হাঁ রহমান, মেয়েটি বড় ভাল ছিলো, তা ছাড়া তার জন্যই আমি সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে দু'বার রক্ষা পেয়েছি।

ঠিক্ বলেছেন সর্দার, ঝুমার উপকারের কথা কোনোদিন আমরা ভুলবোনা।

বনহুর আনমনা হয়ে যায়।

রহমান বলে উঠে—সর্দার, আপনি বের হবেন বলেছিলেন যে?

হাঁ রহমান, বেরুতে হ   । উঠে দাঁড়ালো বনহুর। ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পোষাক পাল্টে নেয়। কোমরের বেল্টে রিভলবারটা গুঁজে নিয়ে বলে—রহমান, তোমাকে যে ভাবে বলেছি ঠিক্ ঐ ভাবে কাজ করবে। দিনের বেলায় জ্যোতিষী বেশে থাকলেও রাতের বেলা তুমি ঝুমার সন্ধান করবে। তবে ফল হবে না আমি জানি, কারণ আর্ম এখন আংহাবারী ও তার কন্যা মালাকে নিয়ে ব্যস্ত আছে।

কিছুক্ষণ গোপনভাবে আলোচনা চলে রহমানের সঙ্গে তারপর রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে বনহুর।

জমাট অন্ধকারে ডাকবাংলোর অদূরে একটি টিলার পিছনে এসে দাঁড়ায়। বনহুর। নিকটে একটি পাথরের সঙ্গে বাঁধা আছে অশ্বটি লাগামসহ। বনহুর অশ্বের লাগাম খুলে নেয়।

তারপর চেপে বসে অশ্ব পৃষ্ঠে।

ফাংহার পাথুরে মাটিতে জেগে উঠে অশ্ব পদশব্দ। পুলিশ বাহিনী মনে করে জ্যোতিষীর দেব দূতের অশ্ব খুরের আওয়াজ। ফাংহাবাসী মনে করে হয়তো কোনো অজানা আগন্তুক ফাংহার বুকে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। তবু তারা আতঙ্কিত হয়, ভীত হয় অজানা আশঙ্কায়।

❑

আর্ম প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে হাজির হলো আংহাবারীর প্রাসাদে। পুরোন আত্মীয়ের পরিচয় দিয়ে আংহাবারীকে বশীভূত করার চেষ্টা করলো সে।

সরল মন ব্যক্তি আংহাবারী খুশিই হলো আর্মকে দেখে, তার আচরণে মুগ্ধ হলেন তিনি। পরম যত্ন সহকারে অন্তপুরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

ধূর্ত আর্ম অন্তপুরে প্রবেশ করে অত্যন্ত নিজের মত করে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো। এমন কি তাঁর ভাবী জামাতা মাহরুফ কবে, কোন প্লেনে, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করছে, সে কথাও জেনেছিলো সে কৌশলে।

আংহাবারী এবং আর্ম যখন অন্তপুরে বসে আলাপ আলোচনা করছিলো তখন মালা এসে উপস্থিত হলো সেখানে। পিতার সঙ্গে কোনো কথার জন্যই সে এসেছিলো হঠাৎ করে। পিতার পাশে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে মালা বেরিয়ে যাচ্ছিলো কক্ষ থেকে।

আর্ম মালাকে দেখা মাত্র বলে উঠলো—এই বুঝি মালা?

আংহাবারী বললেন—হাঁ, আমার একমাত্র কন্যা মালা এসো মা এসো, ইনি আমাদের আত্মীয় হন।

মালা অবাক চোখে তাকালো আর্মের মুখের দিকে। কোনোদিন সে এই আত্মীয়কে দেখে নাই। এমনকি নামও শোনে নাই।

মালা যখন অবাক হয়ে আর্মের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন আর্ম পকেট থেকে একটি মূল্যবান অংগুরী বের করে মালার সম্মুখে বাড়িয়ে ধরে বলে—তোমার জন্য এই অংগুরী এনেছি। বহুদিন পর এলাম কিনা তাই আমাকে চিনতে পারছোনা মালা। সত্যি, কত ছোট্টটি দেখেছিলাম তোমাকে,—আমি নিজেই অন্য কোথাও হলে তোমাকে চিনতে পারতামনা।

আংহাবারীও আর্মের ব্যবহারে কম অবাক হয়নি? তিনি এই ব্যক্তিকে কোনোদিন দেখেছেন কিনা তাঁর মনে পড়ে না। কিন্তু ভদ্রলোকের আচরণ

এবং কথাবার্তায় তাকে পরম আত্মীয় বলেই মনে হচ্ছে। এমন কি অনেক কথাই ভদ্রলোক বলছেন যা তাঁর জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

মালা অংগুরী হাতে না নিয়ে বললো—ওটা বাবার কাছেই রেখে দিন।

আর্ম একটু বিব্রত ভাব মুখে টেনে বললো—বুঝেছি, তুমি আমাকে এখনও আপন জন মনে করতে পারছোনা মালা।

আংহাবারী হেসে বললেন—মা মালা, উনি আরও বহু মূল্যবান জিনিসপত্র এনেছেন। এই দেখো, উপঢৌকনের সামগ্রীর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে ফেলেন আংহাবারী।

মালা সেদিকে না তাকিয়ে বললো—ওটাও আপনি উপঢৌকনের বস্তুগুলোর সঙ্গে রেখে দিন বাবা। আমার কাজ আছে চলি?

মালা বেরিয়ে গেলো, কতকটা সে ক্রুদ্ধ হলো পিতার আচরণে। কে এই অজানা অচেনা লোক যার উপঢৌকন বিনা দ্বিধায় তার সরল পিতা গ্রহণ করেছেন।

মালা বেরিয়ে যেতেই আংহাবারী বললেন—একমাত্র মেয়ে কিনা তাই বড় জেদি, আপনি কিছু মনে করবেন না।

আর্ম বললো—না না, আপনার মেয়ে আমার বোনের মত, আমি তার ব্যবহারে মোটেই অসন্তুষ্ট হতে পারি না। তাছাড়া আপনারা তো আমার আপনজন নন।

আংহাবারী নিপুণ যত্ন সহকারে আর্মকে নিজের শয়ন কক্ষে বসিয়ে তার সঙ্গে নানা রকম কথাবার্তা বললেন এবং তার খাবারের ব্যবস্থা করলেন।

বিদায় মুহূর্তে আর্ম একটা আব্দার জানিয়ে বসলো— আপনি আমার কাকা সমতূল্য যেহেতু আমার বাবা আপনার বন্ধু ছিলেন। আমার একটি অনুরোধ, আপনি আমাদের ওখানে যাবেন।

আংহাবারী বললেন—তা কেমন করে হয়। অসময়ে আমি বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাইনা। তাছাড়া মালা এ বাড়িতে সম্পূর্ণ একা। ওর পাশে এমন কেউ নেই যে তার কাছে ওকে রেখে আমি যাবো।

আর্ম হেসে বললো—মালা কচি শিশু নয় তাই আপনি তাকে সব সময় আগলে রাখবেন।

যদিও মেয়ের বয়স হয়েছে তবু ও কচি শিশুর মতই কতকটা। আমাকে ছাড়া ও কিচ্ছু বোঝে না। শিশুকালে মা মারা গেছে, এ যাবৎ মালা আমার বুকেই আছে।

হোক, তবু তো তার বোঝার বয়স হয়েছে। আপনি যাই বলুন কাকা আপনাকে একবার আমার ওখানে যেতেই হবে। আর্ম নাছোড় বান্দা, আংহাবারীকে নিয়েই যাবে সে।

আংহাবারীকে শেষ অবধি রাজি হতেই হলো। তিনি বললেন—আমি বৃদ্ধ হয়েছি আজকাল মোটেই বাড়ির বার হই না।

বললো আর্ম—তাতে কি আছে, আমি নিয়ে যাবো আবার আমিই আপনাকে পৌঁছে দেবো। বাবা নাই, তাই বড় সাধ আপনি আমার ব্যবসা কেন্দ্রস্থান দেখবেন।

মালার অলক্ষ্যে আংহাবারী বেরিয়ে গেলেন আর্মের সঙ্গে।

ধূর্ত আর্ম নিজের গাড়ি এনেছিলো। গাড়ি অপেক্ষা করছিলো আংহাবারীর গাড়ি বারেন্দায়।

আর্ম আংহাবারী সহ এসে বসলো গাড়িতে। গাড়ির দরজা সে নিজ হাতে বন্ধ করে দিলো। তারপর ড্রাইভারকে বললো—চলো।

গাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেলো আংহাবারীকে নিয়ে তাঁর বাড়ির সদর গেট পেরিয়ে।

ফাংহা শহর অতিক্রম করে গাড়ি ছুটে চললো। রাজপথে অগণিত যানবাহন চলেছে, চলেছে অগণিত মানুষ। আংহাবারীর মুখে মৃদু-মৃদু হাসির আভাস লেগে রয়েছে। পাশে বসে আছে আর্ম।

আংহাবারী বহুদিন বাড়ি ছেড়ে বাইরে বের হননা কারণ তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, কোনো প্রয়োজন হয়ত তার বাইরে বের হবার। অনেক দিন পর বাইরের মুক্ত বাতাসে তার ভালই লাগছে তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি উপভোগ করছেন প্রকৃতির সৌন্দর্য।

আর্ম মাঝে মাঝে বৃদ্ধের মুখে তাকিয়ে দেখছে। একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠছে তার মুখে।

গাড়ি যখন শহরের রাজপথ অতিক্রম করে ফাংহা সাগর অ-
এগিয়ে চললো—তখন বৃদ্ধ আংহাবারীর হুস হলো। বললেন বি-
আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

কেন আমার বাস ভবনে।

এ তো সমুদ্র তীর অভিমুখে গাড়ি যাচ্ছে।

আপনি আমার বাবার বন্ধু তাই প্রথমে আপনা-
নিয়ে যাচ্ছি। আপনি দেখবেন কি ভাবে আমার ব্যব-

অদূরে কোনো
তাতে কিংবা

সমুদ্র তীরে আপনার ব্যবসা স্থল?

সমুদ্র তীরে নয় সমুদ্র বুকে বলতে পারেন, কারণ ব্যবসা স্থল আমার জাহাজে।

জাহাজে?

হাঁ, জাহাজেই আমার ব্যবসা চলে।

তাহলে আপনি আমাকে.........

হাঁ, জাহাজেই আপনাকে নিয়ে যাবো। আপাতত জাহাজেই আমি বাস করি।

কিন্তু?

কোনো কিন্তু নেই, আপনি চুপ চাপ বসে থাকুন, আমি আপনাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।

আর্মের কথায় আংহাবারী খুব খুশি হতে পারলেন না, তিনি বির্মষ মুখে বসে রইলেন।

আর্ম বুঝতে পারলো আংহাবারীর মনে সন্দেহের ছোয়া লেগেছে। বললো আর্ম—আপনি কিছু ভাববেন না, চুপ করে শুধু দেখে যান আমি আপনাকে কোথায় নিয়ে যাই।

আংহাবারীর কথা যেন ফুরিয়ে এসেছিলো, তিনি কি করবেন বা কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। নিশ্চুপ থাকতেও পারছিলেন না, কারণ এখন আর্মের কথাগুলো কেমন যেন অগোছানো মনে হচ্ছিলো তাঁর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়িখানা পৌছে গেলো সমুদ্র উপকুলে। নির্জন সমুদ্র তীর, কোনো জন-প্রাণী এদিকে নেই।

গাড়ি থেকে প্রথমে আর্ম নেমে দাঁড়ালো, গাড়ির দরজা খুলে ধরলো সে—নেমে আসুন।

আংহাবারী ঢোকগিলে বললেন—এ আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন বলুন তো?

বললো আর্ম—চিন্তার কোনো কারণ নাই, নেমে আসুন। কোথায় নিয়ে এলাম বুঝতে পারবেন।

আংহাবারী নেমে এলেন যন্ত্র চালিত পুতুলের মত। তাকিয়ে দেখলেন অদূরে সমুদ্রের ধারে একটি স্পীডবোট অপেক্ষা করছে। একজন চালক বসে আছে স্পীডবোটে।

আর্ম হাত তুলে স্পীডবোটের চালককে স্পীডবোট এগিয়ে আনার জন্য ইঙ্গিত করলো।

স্পীডবোট নিকটে এগিয়ে এলো।

আর্ম বললো—আসুন এবার আমার সঙ্গে।

আংহাবারী এগিয়ে চললেন আর্মের সঙ্গে। মুখমণ্ডল তার বিমর্ষ মলিন। একটা ভীতিভাব ফুটে উঠলো তার চোখে-মুখে। আর্ম তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে কি তার উদ্দেশ্য, কিছুই তিনি বুঝতে পারছে না। এখন তিনি ভাবছেন কেন এসেছিলেন। কেন তিনি এই আগন্তুককে বিশ্বাস করে ছিলেন। এই মুহূর্তে তার করবারই বা কি আছে।

আর্ম আংহাবারীকে নিয়ে স্পীডবোটে চেপে বসলো।

চালক আর্মের ইঙ্গিত পেয়ে স্পীডবোট ভাসিয়ে দিলো।

দ্রুতগামী স্পীডবোট তীর বেগে ছুটে চলেছে। চালক অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বোট চালনা করছে।

আর্মের মুখে হাসির আভাস, দুষ্টোমির হাসি হাসছে সে মৃদু মৃদু।

আংহাবারীর মুখ মলিন, তিনি কোনো কথা বলতে পারছেন না। তার চোখ যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে তিনি সমুদ্রের অথৈ পানির দিকে।

মাথার উপরে সীমাহীন নীল আকাশ।

সূর্যের প্রখর তাপ দগ্ধ করছে বৃদ্ধ আংহাবারীকে। ঘেমে নেয়ে উঠছেন তিনি।

প্রায় সন্ধার কাছাকাছি স্পীডবোটখানা হিরন্ময়ের জাহাজের পাশে এসে পৌছালো। স্পীডবোট জাহাজের পাশে এসে লাগতেই জাহাজের গায়ে একটি দরজা বের হলো যেন একটি সুড়ঙ্গ পথ।

আর্ম আংহাবারীকে লক্ষ্য করে বললো—চলুন।

আংহাবারীর অবস্থা তখন নিতান্ত শোচনীয়, তিনি ঘেমে নেমে উঠেছেন তাকে সঙ্গে করে আর্ম জাহাজের গায়ে সুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হলো।

স্পীডবোটের চালক বসে রইলো তার জলযানে।

আংহাবারীকে নিয়ে আর্ম হাজির হলো হিরন্ময়ের সামনে।

আংহাবারী মনে করলেন হয়তো এই ব্যক্তি আর্মের বাবা। হয়তো কোনো কালে এর সঙ্গে তার পরিচয় ছিলো। বয়স প্রায় তারই সমান হবে কিংবা

দু'চার বছরের ছোটই হবে তাঁর চেয়ে। তবু হাত বাড়ালেন আংহাবারী, মুখে হাসি টেনে বললেন—আপনি বুঝি......

হাঁ, আপনি যা মনে করেছেন তাই! বসুন! গম্ভীর কণ্ঠে বললো হিরন্ময়।

আংহাবারীর বুকে এতক্ষণে একটু সাহস এলো। যা হোক এখানে তবু তার বয়সী একজনকে তিনি পেলেন। হাসি ভরা মুখে আংহাবারী প্রতিক্ষা করতে লাগলেন তার সঙ্গে আলাপ করার জন্য।

ফাংহার ধন কুবেরু আংহাবারী এ মুহূর্তে অসহায়।

আংহাবারী আসন গ্রহণ করার পর তাঁর চারপাশে এসে দাঁড়ালো বলিষ্ঠ চেহারার কয়েকজন লোক। হিরন্ময় বসে আছেন পূর্ব হতেই একটি আসনে। আর্ম বসলো আংহাবারীর ঠিক পাশে।

আংহাবারীর চেয়ারখানা রাখা হয়েছিলো একেবারে জাহাজের রেলিং এর পাশে।

সবার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন আংহাবারী। ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তাঁর মুখখানা। আর্মের দিকে তাকাতে তার ঘৃণা বোধ হচ্ছিলো, কারণ ঐ ব্যক্তি তার পরম আত্মীয় সেজে তাকে নানাভাবে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। শয়তান ছাড়াও ও ব্যক্তি কিছু নয় বুঝতে পেরেছেন তিনি।

আংহাবারী জাহাজে এসে সবার আচরণ দেখেই সন্দেহ হয়েছে তার মনে, তবু মিঃ হিরন্ময় বাবুর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বললেন—আপনারা আমাকে কেন এখানে নিয়ে এলেন? কি চান আপনারা?

হিরন্ময় বললো—আপনাকে এখানে কেন আনা হয়েছে তা একটু পরই জানতে পারবেন। তার পূর্বে একটি প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হবে।

বলুন, একটি কেন শত প্রশ্নের জবাব দেবো। বলুন আপনারা কি জানতে চান? তবু আমাকে আমার কন্যা মালার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন তো? অসহায় করুণ কণ্ঠে বললেন আংহাবারী।

হিরন্ময় আর্মের দিকে তাকিয়ে বললো—এর ভাবী জামাতা কবে বিদেশ থেকে ফিরে আসছেন তুমি তা জেনে নিয়েছো আর্ম?

হাঁ, জেনে নিয়েছি।

হিরন্ময় এবার বললো—তাহলে আর কিছু জানার নেই।

আংহাবারী বলে উঠলেন—আমার মাহরুফ কবে বিদেশ থেকে ফিরে আসছে জেনে আপনাদের লাভ কি?

লাভ! প্রচুর লাভ আছে, আপনার বিপুল ধন-সম্পদ আপনার কন্যা মিস মালার তাই না?

হাঁ, আমার অভাবে আমার সব সম্পত্তি মালার।

তাহলে আপনার জামাতা এই সম্পত্তির মালিক হচ্ছে, তাই না?
হাঁ, আমার মাহরুফই আমার ছেলের মত।
আচ্ছা মাহরুফ ছাড়া অন্য যদি কেউ আপনার জামাতা হয়—তাহলে সেই কি আপনার ধন-সম্পদের মালিক হবে না? বলুন? হিরন্ময় আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা পৈশাচিক ভাব।
আংহাবারীর অবস্থা করুন, তিনি ঢোক গিলে বললেন—এ সব আপনারা কি বলছেন?
অট্টহাসি হেসে উঠলো হিরন্ময়।
জাহাজে তখন রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। লাইটের বদলে চার পাশে চারটা মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে হিরন্ময়কে শয়তান দলের নেতা বলে মনে হচ্ছে।
বললেন আংহাবারী—আপনারা যা চাইবেন আমি তাই দেবো। আমাকে পৌছে দিয়ে আসুন আমার বাড়িতে।
হাঁ, আপনাকে এক্ষুণি আপনার বাড়িতে পৌছে দেওয়া হবে। সে বাড়ি থেকে আর কোনোদিন আপনার মেয়ে মালার কাছে যেতে পারবেন না।
কেন, আমার কি অপরাধ?
অপরাধ মোটেই নেই।
তবে কেন আমাকে আপনারা.........
হিরন্ময় ইঙ্গিত করতেই আর্ম স্বহস্তে বৃদ্ধ আংহাবারীকে ঠেলে দিলো জাহাজ থেকে নিচে সমুদ্র গর্ভে।
অন্ধকারে আংহাবারীর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেলো কিন্তু কি বললেন তিনি বোঝা গেলো না।
হিরন্ময় আর্মের দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো।
হাসলো হিরন্ময়।
এমন সময় এসে দাঁড়ালো মিস রীনা।
গম্ভীর তার মুখমণ্ডল, বললো সে আর কতদিন তোমাদের এই লীলাখেলা চলবে?
হিরন্ময় বললো—যতদিন পৃথিবী বেঁচে থাকবে।
কি বললে? মিস রীণা আজ হিরন্ময়কে তুমি বলে সম্বোধন করে চললো।
হিরন্ময় একটা চেয়ারে বসে বললো—কেনো, আমার সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারছো না রীণা?
পারছি কিন্তু যা তুমি বললে তা কি সত্য? পৃথিবী যত দিন বেঁচে থাকবে—ততদিন তোমার পাপ লীলা চলবে?

হাঁ রীণা, চলবে। আমি মরে যাবো আমার প্রতিটি রক্ত বিন্দু থেকে জন্ম নেবে লাখো হিরন্ময় হাঃ হাঃ হাঃ তারা আমার চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না। কাজেই আমি যা বললাম তা মিথ্যা নয়।

রীণা! বলে উঠলো—কিন্তু তোমার মত হিরন্ময়কে নিঃশেষ করার জন্যও জন্ম নেবে লাখো লাখো.........

বলো চুপ করলে কেন? বলো?

লাখো মহৎ প্রাণ ব্যক্তি।

রীণা! তোমার মুখে এ ধরনের কথা শোভা পায় না। তুমিও আমার এ পাপ লীলার সহকারিণী।

তুমিই আমাকে পাপ কাজে লিপ্ত করছো। তোমার কথায় আমি খুন করেছি একটি নয়, দুটি নয়, বহু নিরীহ মানুষকে, আজও তুমি আমাকে ডেকেছিলে, আমি আসিনি। পিতার বয়সী একজন অসহায় বৃদ্ধকে আমি সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করতে পারবো না।

তুমি এই প্রথম আমার অবাধ্য হলে মিস রীণা। কিন্তু মনে রেখো তুমি ভাল কাজ করো নি।

এমনি ভয় দেখিয়েই তুমি আমাকে হাতের মুঠায় রেখেছো হিরন্ময়। আমিও ভয় পেয়ে ভীত হয়ে তোমার সব কাজে সহায়তা করেছি কিন্তু.........

চুপ করো, আজ এর বেশি কোনো কথা উচ্চারণ করো না। তা হলে তুমি নীল সাগর তলে নীল কমল হতে পারবে না।

নীল কমল?

হাঁ, তোমাকে আমি নীল সাগর তলের নীল কমল করবো।

সিম রীণার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

❑

বৃদ্ধ আংহাবারী সাগর বক্ষে নিক্ষিপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্পীডবোট থেকে চালক ঝাপিয়ে পড়লো, শব্দ লক্ষ্য করে। অন্ধকার হলেও আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিলো সবকিছু। চালক আংহাবারীর দিকে সাঁতার কেটে এগুলো এবং কৌশলে আংহাবারীকে ধরে ফেললো।

আংহাবারী সাগরবক্ষে নিক্ষিপ্ত হবার পর পরই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন, তলিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি দ্রুত গতিতে।

স্পীডবোটের চালক তাকে তুলে নিলো কাঁধে এবং স্পীডবোটের দিকে সাঁতার কেঁটে এগিয়ে চললো।

স্পীডবোটখানা পূর্ব হতেই জাহাজের সঙ্গে মজবুত করে বাঁধা ছিলো, তাই চালক আংহাবারীর সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে অতি সহজেই স্পীডবোটে চেপে বসলো।

সাগরবক্ষ শান্ত এবং স্থির ছিল, তাই সহজেই স্পীডবোটের চালক আংহাবারীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলো।

আংহাবারীর সংজ্ঞাহীন দেহটা স্পীডবোটে তুলে নিয়ে রশি খুলে দিলো চালক দ্রুত হস্তে। রশি খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই স্পীডবোট ষ্টার্ট দিলো সে।

স্পীডবোটখানা উল্কা বেগে ছুটে চললো অন্ধকার সাগরবক্ষ ভেদ করে।

তখন হিরন্ময় দলবল নিয়ে ফুর্তি করে চলেছে।

আর্ম বললো—স্যার, প্রথম কাজ শেষ হলো আমার পাওনাটা?

পাবে পাবে এইত সবে শুরু। প্রথম কাজ শেষ হলো এবার দ্বিতীয় কাজ, মাহরুফ বিদেশ থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে উধাও করা এবং আমাদের নির্বাচিত কোন যুবককে মাহরুফ বানিয়ে মিস মালার পাশে তার ভাবী স্বামীর বেশে অভিনয় করা......

আর তৃতীয় কাজ?

তৃতীয় কাজ হলো আংহাবারীর সব ঐশ্বর্য ধীরে ধীরে আত্নসাৎ করা। তখন শুধু তুমি নও আমার সব সহকারীগণকে পাওনা মিটিয়ে দিবো। সিম্মো, আর্ম আর হিরোসু তোমরা তিনজন মিলে খুঁজে বের করো এমন এক যুবক, যে আমাদের কথায় রাজি হবে। অবশ্য যে রাজি না হবে তার জন্য আছে রিভলবারের একটি গুলী। হাঁ, তাকে আরও বলে দিও, আমাদের হাতের পুতুল হয়ে তাকে কাজ করতে হবে।

সিম্মো, আর্ম আর হিরোসু সম্মতি জানালো।

❑

এরোড্রামে প্লেন পৌছতেই দু'জন লোক এগিয়ে গেল।

প্লেন থেকে নেমে এলো মাহরুফ।

ফাংহায় তার আপনজন কেউ নেই। শুধু আছে তার ভাবী বধু মালা ও তার বাবা আংহাবারী। মাহরুফ মালাকে দেখে নাই কোনোদিন, আংহাবারীকে সে জানে এবং চেনে। এরোড্রামে আংহাবারী তার কন্যা মালা সহ উপস্থিত থাকার কথা আছে কিন্তু মাহরুফ কাউকেই দেখতে পায় না।

কু'চক্রি হিরন্ময়ের চক্রান্তে মাহরুফের পৌছবার পূর্বেই কৌশলে আর্ম মালার যাত্রা বন্ধ করে দিয়েছে। কালো পোশাক পরে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে আর্ম মালার বাড়িতে।

মালা তখন এরোড্রামে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে আম চোখে রুমাল চাপা দিয়ে হাজির হলো। যদিও মালা আর্মকে দেখবা মাত্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো তবু সংযত হলো সে পিতার সংবাদ জানার জন্য। মালা জানতো ঐ লোকটির সঙ্গে তার বাবা বেরিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আর তিনি ফিরে আসেন নি।

তিন সপ্তাহ কেটে গেছে, মালা কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে পড়েছে। সংবাদপত্রে পিতার নিরুদ্দেশ ব্যাপার নিয়ে নানাভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, তবুও পিতার কোনো সন্ধান সে পায়নি।

আজ সেই আগন্তুকটিকে সম্মুখে পেয়ে মালার অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে উঠলো, তবু সে স্থিরভাবে এসে দাঁড়ালো আর্মের সম্মুখে।

আর্ম মালাকে দেখবা মাত্র হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো, তারপর বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললো—বোন, আমি দুঃখিত, সেদিন এক দুর্ঘটনায় পিতৃসমতুল্য আংহাবারী নিহত হয়েছেন। এমন কি তার লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কোথায় কি ভাবে তার বাবা নিহিত হয়েছেন এবং কেনই বা তার লাশ পাওয়া যায়নি এর কিছুই শোনার জন্য মালা আগ্রহ প্রকাশ করে নি। শুধু তার কানে পৌছেছিলো পিতৃসমতুল্য আংহাবারী নিহত হয়েছেন......এর বেশি মালা আর কিছু শুনতে পারেনি। কারণ ছুটে চলে গিয়েছিলো অন্তপুরে এবং আছাড় খেয়ে পড়েছিলো পিতার শূন্য বিছানায়। তারপর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো মালা।

সেই সুযোগ নিয়ে আর্ম এসে উপস্থিত হয়েছিলো এরোড্রামে। গাড়িখানা প্রস্তুত ছিলো এরোড্রামের বাইরে।

মাহরুফ এগিয়ে আসতেই আর্ম তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে চোখে রুমাল চাপ দিয়ে কেঁদে উঠলো। মাহরুফ প্রথমে অবাক হলো তারপর জিজ্ঞাসা করলো—আপনি কে এবং কেনই বা কাঁদছেন?

আর্ম রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বললো—দুঃসংবাদ, গত কয়েক দিন পূর্বে আপনার ভাবী শ্বশুর আংহাবারী কোনো এক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন এ কারণে মালাও আসতে পারেনি। আমি এসেছি আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য।

মাহরুফ কথাটা শুনে উচ্ছসিতভাবে কেঁদে উঠলো। পর মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নিয়ে এগুলো সে আর্মের সঙ্গে সঙ্গে।

গাড়ি অদূরে অপেক্ষা করছিলো।

আর্ম গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

আর্ম বললো—উঠুন।

মাহরুফ গাড়িতে উঠে বসলো।

গাড়ি জনমুখর রাজপথ বেয়ে এগিয়ে চললো। নির্জন একটি বাড়ির সম্মুখে এসে থামলো গাড়িখানা। মাহরুফ অবাক হলো, সে জানতো তার ভাবী শ্বশুর বাড়ি সাধারণ বাড়ির মত নয়। রাজ প্রাসাদ সমতুল্য বাড়িই হবে কিন্তু একি এমন অন্ধকারময় জনহীন বাড়ি ব্যাপার কি। মাহরুফ কম অবাক হলো না।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরতেই নেমে দাঁড়ালো আর্ম, বললো—আসুন।

মাহরুফ নেমে দাঁড়ালো। কেমন যেন সন্দেহ পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে লাগলো সে বাড়িখানার দিকে। বাড়ির গেটে কোনো প্রহরী নাই বা নেই কোনো লোহার ফটক। সে জানতো আংহাবারী ফাংহা শহরের সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি অথচ.........

মাহরুফের চিন্তা ধারায় বাধা পড়ে বলে উঠে আর্ম— দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ভিতরে চলুন।

হুস হলো মাহরুফের সে আর্মের সঙ্গে ভিতর বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

❑

আর্ম এবং তার সঙ্গীদ্বয় একটি ভদ্র সন্তানকে পাকড়াও করে নিয়ে এলো। তাকে চাকরি দেবে বলে নিয়ে এলো তারা নিজেদের আস্তানায়।

যুবক সবে মাত্র পাশ করে বেরিয়েছে। চেহারা সুন্দর, ব্যবহার অমায়িক। চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো এমন সময় আর্মের সঙ্গে দেখা এবং পরিচয়।

যুবকের নাম আলমা হক।

আর্ম বললো—শোন আলমা তোমার চাকরি হবে কিন্তু প্রথমেই তোমাকে নাম পাল্টাতে হবে রাজি আছো?

আলমা এখন অসহায় চাকরি তার চাই। পৃথিবীতে তার কেউ নেই। অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে কিন্তু আর পারছে না কতদিন উপোস দিয়ে কাটানো যায়। আলমা আর্মের কথায় রাজি হলো।

আর্ম এরপর বললো—নাম পাল্টে তোমার নাম হবে মাহরুফ। তোমাকে আংহাবারীর কন্যা মিস মালার সঙ্গে তার ভাবী স্বামীর অভিনয় করতে হবে।

এবার আলমা অকস্মাৎ আঁতকে উঠলো। চোখ দুটো স্থির হলো আর্মের মুখের উপর।

আর্ম বুঝতে পারলো তার কথাটা ঠিক্‌মত গ্রহণ করতে পারছে না। আর্ম সঙ্গীদের দিকে তাকালো তার দুজন সঙ্গী সিম্মো আর হিরোনু।

তারা সজাগ হয়ে দু'জন দুপাশে দাঁড়ালো আলমার! আলমা-এর ওর মুখে তাকাতে লাগলো।

বললো আর্ম—আমি আমার কথায় রাজি না হও তবে...একখানা ছোরা বের করে টেবিলের মাঝখানে গেঁথে ফেললো।

চমকে উঠলো আলমা।

আর্ম বললো—রাজি?

আলমা অসহায়ভাবে তাকালো আর্মের দিকে, তারপর দৃষ্টি তার ফিরে এলো টেবিলে গাঁথা ছোরাখানার দিকে। ঢোক গিলে বললো আলমা—আচ্ছা আমি রাজি আছি, আপনারা যা বলবেন তাই করবো।

আর্ম এবার বন্দী মাহরুফের পোশাক পরিচ্ছদ এনে পরিয়ে দেয় আলমার দেহে। তাকে মাহরুফ সাজিয়ে পুনরায় ওরা গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে চলে আংহাবারীর বাস ভবনে।

মালা তো কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে পড়েছে, পিতার নিহত হবার সংবাদ তাকে একেবারে শোকাতুর করে তুলেছে।

মাহরুফ বেশী আলমাকে নিয়ে আর্ম এক সময় পৌছে গেলো আংহাবারীর বাসভবনে।

মাহরুফকে দেখে বাড়ির সবাই খুশি হবার কথা। মহা ধুম-ধাম সহকারে আজ সে এ বাড়িতে আসবে তা নয় একটা অনাড়ম্বর পরিবেশে এলো মাহরুফ।

বাড়ির সবাই তাকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানালো। মালাও এলো অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে মাহরুফকে অভিনন্দন জানালো।

আলমা তো আসলে মাহরুফ নয় তাই তার মনে দ্বন্দ্ব-দ্বিধা আর সঙ্কোচিত ভাব। আর্ম তাকে সাহায্য করে চললো, কিভাবে কেমন আচরণ করবে, কিভাবে সে কথাবার্তা বলবে। কিভাবে সে খাবার টেবিলে বসে কাটা চামচে বিদেশ ফেরতাদের মত খাবে।

আলমা বিব্রত বোধ করছিলো। তবু সে আর্মের রক্ত চক্ষুর ভয়ে নীরবে তার নির্দেশ পালন করে চললো।

মালা শোকে মুহ্যমান, তাই তেমন করে তার ভাবী স্বামীকে সমাদর জানাতে পারছিলো না। এমনকি খাবার টেবিলেও সে এসে বসতে পারছিলো না। সব সময় অশ্রুসিক্ত নয়নে পিতার কথা চিন্তা করছিলো।

ধূর্ত আর্ম সুযোগ খুঁজছিলো কি করে আলমার সঙ্গে মালার মিলন করবে সে।

মালা যখন নিজের ঘরে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন তখন আর্ম আলমাকে নিয়ে হাজির হলো সেখানে।

মালা এলোমেলোভাবে বসেছিলো, আর্মের সঙ্গে তার ভাবী স্বামীকে তার কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বিরক্ত বোধ করলো কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বললো না সে।

আর্ম হেসে বললো—বোন আপনি পিতার শোকে কাতর, তাই মাহরুফ এসেছে আপনাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।

মালা দৃষ্টি তুলে ধরলো আলমার মুখের দিকে।

আর্ম আলমার পিঠে মৃদু চাপ দিয়ে কিছু ইংগিত করে বেরিয়ে গেলো সেই কক্ষ থেকে।

মাহরুফবেশী আলমা মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো।

আর্ম বেরিয়ে যাবার পর মাহরুফ কোনো কথা না বলে বা তাকে সান্ত্বনা বাক্য না জানিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। মালা অবাক হলো, বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে অথচ এমন আচরণ বিস্ময়কর বটে। সেই যে আসার পর থেকে কয়েক বার সামনা-সামনি হয়েছে মালা ওর কিন্তু এখন পর্যন্ত একটি কথাও হয়নি তাদের মধ্যে।

অগত্যা মালাই এগিয়ে এলো, রুমালে নিজের চোখ মুছে বললো—জানি আপনি বাবার জন্য দুঃখ পেয়েছেন। সত্যি বাবার মৃত্যু একেবারে বিস্ময়কর, আমরা কেউ ভাবতে পারিনি যে তিনি আমাদের এভাবে ছেড়ে যাবেন।

আলমা পুনরায় চোখ তুললো, আর্ম তাকে শিখিয়ে দিয়েছে মালাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। বললো আলমা—বাপ-মা কারো চিরদিন থাকে না, বাবা মারা গেছেন তাতে দুঃখ করে লাভ নেই.........

মালা আলমার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলো না, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বললো আলমা—যদিও আমি আপনার বাবাকে স্বচক্ষে দেখিনি......

এ্যাঁ কি বললেন?

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল স্মরণ হলো, বললো আলমা—দেখেছি কিন্তু......

থাক্ সে কথা, আপনি বসুন।

বসলো আলমা।

মালাও এসে বসলো তারপাশে একটা চেয়ার টেনে।

আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করছিলো আর্ম। সে ভাবছে কোন রকমে মালার সঙ্গে মিলন হলেই বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেলবে। আলমার সঙ্গে যদি

মালা চিরদিনের জন্য আবদ্ধ হয় তাহলে আংহাবারীর ঐশ্বর্য ধন-সম্পদ করায়ত্ত করতে বেশি সময় লাগবে না।

❑

চোখ মেলে তাকালেন আংহাবারী। পাশে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে একটি লোক। কে এই ব্যক্তি আর কোথায়ই বা তিনি এখন শুয়ে আছেন।

আংহাবারীকে চোখ মেলতে দেখে বললো লোকটি—আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন।

আংহাবারী বললেন—আমি এখন কোথায়?

ফাংহার কোন এক নির্জন স্থানে আপনি এখন শুয়ে আছেন!

আপনি কে? এবং কি আপনার পরিচয়? আপনি কি সেই নরপশুদের দলের কোন লোক?

বললো সে—আমি যেই হইনা কেনো, আপনার বন্ধু লোক। আপনার কোন ক্ষতি সাধন করবোনা। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান।

কিন্তু যতক্ষণ আপনার পরিচয় জানতে না পারবো—ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিনা। বলুন আপনি কে?

আংহাবারী নাছোড়বান্দা হয়ে পড়েলেন। তিনি আরও বললেন—যে শয়তান আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো, আপনি তার দলের লোক নন আমি বুঝতে পেরেছি। আরও বুঝতে পেরেছি আপনি কোন মহৎ ব্যক্তি।

স্পষ্টভাষী বৃদ্ধ আংহাবারী এতোগুলো কথা এক সঙ্গে বলে থামলেন। রীতিমত হাঁপাচ্ছিলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি যতক্ষণ জানতে না পারছেন, সেই দুষ্টলোকের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছেন, ততক্ষণ আশ্বস্ত হতে পারছেন না। তাই পাশে যে ব্যক্তি বসেছিলো সে বললো—আমিই আপনাকে সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়েছি—কাজেই আমি আপনার বন্ধুজন একথা কি আপনার মনকে নিশ্চিন্ত করতে পারেনা?

আংহাবারী বললেন—না, আমি জানতে চাই কে আপনি, যার ক্ষমতা অসীম! সাগর গহ্বরে আমি তলিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু সেই অতল গহ্বর থেকে কি করে আপনি আমাকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন, নিশ্চয়ই আপনি সাধারণ ব্যক্তি নন......

আপনি বেশি ভাবছেন কিন্তু আসলে আপনাকে উদ্ধার করতে আমার বেশি বেগ পেতে হয়নি কারণ আমি তখন সাগর বক্ষেই ছিলাম।

তাহলে আপনি......

আমি সেই স্পীড বোট চালক।
আপনি...আপনি এতো মহৎজন?
মহৎ কিনা জানিনা তবে লোকের বিপদ মুহূর্তে আমি নিশ্চুপ থাকতে পারিনা। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন আমি আপনাকে সব বলবো।
এখানে যখন মৃত্যুপথের যাত্রী আংহাবারী কথা-বার্তা বলছিলেন তখন হিরন্ময় ও মিস রীণা আলাপ আলোচনায় মত্ত। বললো হিরন্ময়—মালা এখন অনেকটা সামলে নিয়েছে বলে জানিয়েছে আর্ম। আলমা নামক যুবক তার সঙ্গে মাহরুফের অভিনয় করে চলেছে। অবশ্য প্রথম নাকি আলমা এ ব্যাপারে রাজি হচ্ছিলো না। কিন্তু আর্ম তাকে কৌশলে বাগে এনেছে.......
হিরন্ময় তোমরা শুধু আলমাকেই নয় সবাইকে কৌশলে বাগে এনে কার্যসিদ্ধ করে নাও। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ ছাড়া তোমাদের কোন চিন্তা নাই।
সে কথা অবশ্য সত্য, মিস রীণা।
কিন্তু কতদিন চলবে তোমাদের এই পৈশাচিক কাণ্ড? না আর আমি সহ্য করতে পারছিনা। তোমাদের কথায় আমি বহু নরহত্যা করেছি......
কিন্তু তুমি আংহাবারীকে হত্যা করতে রাজি হও নি।
হাঁ, তাকে দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছিলো, এমন একজন অসহায় বৃদ্ধকেও তোমরা রেহাই দিলে না। কি নিষ্ঠুরভাবে তাকে তোমরা হত্যা করলে।
জানো, এ হত্যার পিছনে আমাদের কত বড় স্বার্থ সিদ্ধ হয়েছে।
হিরন্ময় মনে রেখো তোমাদের এই জঘন্য ব্যবসা একদিন ধ্বংস আছে।
রীণা!
হাঁ, আমাকে ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, নানাভাবে তোমাদের কাজে টেনে নিয়েছিলে কিন্তু......
থামলে কেন, বলো কিন্তু কি?
কিন্তু বেশি দিন তোমাদের এই ব্যবসা টিকবে না।
সত্যি? দাঁতে দাঁত পিষে বললো হিরন্ময়।
হাঁ সত্যি। বললো রীণা।
এমন সময় সেখানে এলো আর্ম, মুখে তার হাসির আভাস। বললো—স্যার মিস মালাকে আমি হাতের মুঠায় এনেছি। এখন সে আলমার সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করেছে। তবে ঘনিষ্ঠভাবে এখনও সে মিশতে চায় না কারণ পিতার শোক এখনও তার মন থেকে মুছে যায়নি।
হিরন্ময় বললো—মাহরুফ এখন কোথায়?
তাকে আমাদের শহরের গুদামে আটকে রেখেছি।
দেখো পালিয়ে না যায়।

না স্যার, পালাতে পারবে না, তার হাতে পায়ে শিকল বাধা আছে।

হিরন্ময় বলে উঠলো—আসল মাহরুফ আজ অন্ধকারময় জেলে পঁচে মরছে আর নকল মাহরুফ আজ মিস মালার হৃদয় জয় করবার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। কিন্তু মনে রেখো আর্ম, যখনই আলমা ও মালার মধ্যে প্রেম জমে উঠবে তখনই আলমাকে সরিয়ে ফেলতে হবে পৃথিবী থেকে। অবশ্য ততদিনে আংহাবারীর ঐশ্বর্য এবং সোনাদানা আমরা আত্মসাৎ করে ফেলতে সক্ষম হবো কি বলো?

রীণা বললো—এমন নরপশু তুমি হিরন্ময়? একটা তরুণ-তরুণীর জীবন তরঙ্গ প্রথম শুরুতেই ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতে চাও।

হাঁ মিস রীণা, কিন্তু তাদের জন্য তোমার এত দরদ কেন? বুঝেছি, আমার প্রেমে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। আমি তোমার বাবার বয়সী তাই......

চুপ করো হিরন্ময়, সব সময় তোমার নোংরা কথা আমার ভাল লাগে না।

সত্যি বলছো?

দৃঢ়কণ্ঠে বলে রীণা—হাঁ।

কথাটা বলে বেরিয়ে যায় মিস রীণা।

হিরন্ময় বাঁকা চোখে তাকায় আর্মের দিকে। গম্ভীর কণ্ঠে বলে—আর্ম, মিস রীণার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার তাকে নীল সাগর তলে নীল কমল বানাতে চাই।

আর্ম বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো—নীল সাগর তলে নীল কমল সে কেমন স্যার?

আজ নয় পরে বলবো, যেদিন আংহাবারীর সব কিছু আমার হাতের মুঠায় চলে আসবে আর আসবে মিস মালা। সেদিন রীণার কাজ শেষ হবে তাকে বানাবো নীল সাগর তলে নীল কমল।

❑

অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় সিগারেট পান করে চলেছে বনহুর। দৃষ্টি তার সম্মুখের জানালা দিয়ে অনেক দূরে ফাংহা পর্বতের সুউচ্চ চূড়ায় গিয়ে আটকা পড়েছে। গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে সে।

রহমান অনেকক্ষণ থেকে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কথা বলার সাহস সে পাচ্ছে না।

বনহুর অন্যমনস্ক।

রহমান সজাগ।

এক সময় রহমান বলে উঠলো—সর্দার!

বনহুর সিগারেট-টা এ্যাসট্রের মধ্যে গুজে রেখে সোজা হয়ে বসে চোখ তুললো—বলো?

আজ এক সপ্তাহকাল আপনি ছিলেন না।

তাই তুমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো বুঝি?

সর্দার ঝুমার কোনো সন্ধান পেয়েছেন কি?

হতাশ কণ্ঠে বললো বনহুর—না, ঝুমার কোন সন্ধান আমি পাইনি রহমান। জানি তুমিও তার কোনো খোঁজ পাওনি। কত জায়গায় আমি তাকে খুঁজেছি......একটু থেমে বললো বনহুর—আশ্চর্য, আর্ম ঝুমাকে কোথায় নিয়ে গেছে বুঝতে পারলাম না।

সর্দার, ঝুমাকে আর্ম নিয়ে গেছে?

তাছাড়া ঝুমার কোনো শত্রু ছিলো না।

সর্দার আর কতদিন আমাদের এখানে থাকতে হবে?

ঠিক্ বলতে পারছি না তবে মনে হয় কাজ আমার শেষ হয়ে এসেছে।

আংহাবারী এখন কেমন আছেন?

অনেকটা ভাল তবে কন্যা মালার জন্য খুব দুঃচিন্তায় আছেন তিনি।

মিস মালার সংবাদ কি, জানতে পারি কি?

হাঁ পারো, মিস মালা যদিও পিতার শোকে মুহ্যমান তবু সে তার ভাবী স্বামী মনে করে আলমার সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করছে। তবে এখনও তাদের মধ্যে প্রকৃত প্রেম ঘটে উঠেনি। হয়তো মালা আলমাকে ভালবেসে ফেলেছে কিন্তু আলমার এখনও দ্বিধা কেটে উঠেনি। কারণ সে জানে মালার মত মেয়েকে পাওয়া তার কোনোদিন ভাগ্যে ঘটবে না বা এটা সম্ভবও নয়।

আশ্চর্য বটে! বললো রহমান।

বললো বনহুর—আশ্চর্য মোটেই নয়। জানো না রহমান আগুন আর পানি কোনোদিন এক হয় না। আংহাবারী শুধু ধন কুবেরুই নন তিনি একজন মহৎ প্রাণ মানুষ। কন্যাকেও তিনি সেইভাবে গড়ে তুলেছেন। মিস মালার সঙ্গে আলমার কোনোদিনই মিলন ঘটতে পারে না। মাহরুফ মিস মালার যোগ্য পাত্র.........

কিন্তু শুনেছি সে নাকি নিহত? তাকে আর্মের দল হত্যা করেছে?

না তাকে হত্যা করেনি তবে অচিরে তাকে হত্যা করবে বলে তারা মনোস্থির করে নিয়েছে। রহমান তোমার সঙ্গে কিছু গোপন আলাপ আছে, বসো আমার পাশে।

রহমান সর্দারের নির্দেশ মত বসে পড়লো।

বনহুর আর রহমান মিলে চললো কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা।
বনহুর উঠে পড়লো।
রহমান বললো—সর্দার আপনি এক্ষুণি বের হবেন?
বললো বনহুর—হাঁ আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে। তুমি সকাল বেলা বের হবে এবং যে ভাবে তোমাকে কাজের নির্দেশ দিলাম সেই ভাবে কাজ করবে। মনে রাখবে আমাদের হাতে সময় এখন অতি সামান্য।
আচ্ছা সর্দার। রহমান কুর্ণিশ জানালো।
বনহুর ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে।
রহমান দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে।
বনহুর অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেলো, আর তাকে দেখা যাচ্ছে না।
হঠাৎ চমকে উঠলো রহমান কেউ যেন তার কাঁধে হাত রাখলো।
ফিরে তাকিয়েই বিস্মিত হলো রহমান দেখলো আর্ম দাঁড়িয়ে আছে তার কাঁধে হাত রেখে। রহমান মুহূর্ত বিলম্ব না করে আর্মের চোয়াল লক্ষ্য করে বসিয়ে দিলো এক ঘুষি।
আর্ম টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলো হুমড়ি খেয়ে ভূতলে। সে ভাবতেও পারেনি এই লোকটা তাকে আচম্বিত মেরে দেবে। যদি জানতো তাহলে আর্ম প্রথমেই আক্রমণ করতো ভীষণভাবে।
রহমান মুহূর্তে টেবিল থেকে তুলে নিলো পিস্তলখানা তারপর আর্মের বুক লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরলো। বললো—খবরদার এক পা এগুবেনা শয়তান।
আর্ম অস্ত্র শূন্য ছিলো না, তার প্যান্টের পকেটেই ছিলো একটি গুলী ভরা রিভলবার কিন্তু আর্ম সে রিভলবার বের করার সুযোগ পেলো না।
রহমান দ্রুত তার পিস্তলখানা আর্মের বুকে চেপে ধরলো।
আর্ম ততক্ষণে ভূতল শয্যা থেকে উঠিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বুকে আগ্নেয় অস্ত্রের অস্তিত্ব অনুভব করায় স্থবিরের মত হতবাক হয়ে যায়।
রহমান বললো—তোমাকে খুঁজছিলাম, যদিও আমার মালিক তোমার সন্ধান জানে। তোমাকে আমি এত সহজে আয়ত্ত্বের মধ্যে পাবো ভাবতেও পারি নি। বন্ধু, এবার বলো ঝুমা কোথায়?
আর্ম যেন অবাক হলো, বললো সে—ঝুমা! কে সে ঝুমা? আমি তো ঝুমা বলে কাউকে চিনি না?
রহমান পিস্তলের আগা আরও বেশি শক্ত করে চেপে ধরলো তারপর বললো—ঝুমাকে তুমি চেনো না বন্ধু? সত্যি তুমি তাকে দেখোনি কোনদিন?
যদি বলি হাঁ তাকে চিনি, আর দেখেওছি বহুবার।
তবে বলো—কোথায় সে?

জানি না।

তুমি মিথ্যা কথা বলছো। জানো আজ তোমার রক্ষা নেই। পিস্তলের একটা গুলী তোমাকে হজম করতেই হবে।

বিশ্বাস করো, আমি তোমার কোনো অন্যায় করতে আসিনি...

এসেছিলে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে, তাই না? দাঁত পিষে বললো রহমান।

আর্ম বুকে চেপে ধরা পিস্তলের আগার দিকে তাকিয়ে বললো—তুমি তুমি বিশ্বাস করবে না কিন্তু শপথ করে বলছি আমি তোমার সঙ্গে দুশমনি করতে আসিনি।

তবে বন্ধুজনের মত বলো ঝুমা কোথায়।

তুমি তা হলে তোমার দক্ষিণ হস্তখানা আমার বুক থেকে সরিয়ে নেবে?

সে কথা এ মুহূর্তে আমি ঠিক্ করে বলতে পারবো না। কারণ যতক্ষণ আমি ঝুমার সন্ধান না পাবো।

ঝুমা বাংলোতেই আছে.........

ঝুমা বাংলোতেই আছে?

হাঁ।

মিথ্যে কথা।

না সত্যি বলছি।

কোথায় সে বলো?

পাশের কামরায়.........

ঠিক ঐ মুহূর্তে রহমান অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সেই সুযোগে আর্ম রহমানকে এক ধাক্কায় সরিয়ে পালিয়ে যায় সে জানালা টপকে বাইরে।

রহমান সম্বিৎ ফিরে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে গুলী নিক্ষেপ করে বাইরের অন্ধকারে।

❑

মিস রীণা এই সেই নীল সাগর তলে আমার স্বর্ণ গুহা। জানো—এখানে আমাদের কত সোনা আছে? কথাগুলো হিরন্ময় রীণাকে লক্ষ্য করে বললো।

রীণা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো, গভীর সাগর তলে অদ্ভুত এক সুড়ঙ্গ পথ। সেই সুড়ঙ্গ পথে হিরন্ময় তাকে নিয়ে এসেছে এখানে। চারিদিকে থম থমে ভাব। বিরাট গুহা, সাগরের তলে এমন একটি গোপন আস্তানা আছে, কেউ কোনোদিন ভাবতেও পারবে না।

রীণাকে অবাক হতে দেখে হিরন্ময় মৃদু হাসে। বলে উঠে সে—রীণা এই নীল সাগর তলে তুমি হবে নীল কমল। যুগ যুগ ধরে তুমি থাকবে এখানে.........

আর তুমি! বললো রীণা।

হিরন্ময় বললো—আমি! আমিও থাকবো—তোমার পাশে। এসো রীণা, স্বর্ণ গুহার ভিতরে চলো। দেখবেনা ভিতরে কত সোনা।

দেখাবে? আমাকে স্বর্ণ গুহার ভিতরে নিয়ে যাবে তুমি? সত্যি বলছো তো?

হাঁ, এতদূর যখন এনেছি তখন স্বর্ণগুহার মধ্যে তোমাকে না নিয়ে গিয়ে পারি। এসো আমার সঙ্গে।

রীণার দু'চোখে আনন্দ ধরে না।

নীল সাগর তলে, দুর্গম সুড়ঙ্গ পথে হিরন্ময় তার হাত ধরে নিয়ে এসেছে। অদ্ভুত এ সুড়ঙ্গ পথ চারিদিকে। অপূর্ব, সুন্দর শুধু সোনাদানা আর মূল্যবান হীরা পাথর। রীণা দু'নয়ন ভরে দেখছে। এ সব নাকি তারই হবে সে হবে নীল সাগর তলের নীল কমল।

হাঁ, তুমি হবে নীল সাগর তলে নীল কমল......হাঃ হাঃ হাঃ.........হাঃ হাঃ হাঃ.........হাঃ হাঃ হাঃ.........

হিরন্ময়ের হাসির শব্দে শিউরে উঠে মিস রীণা, সে ফিরে তাকাতেই ভীত হয়ে উঠে। হিরন্ময়ের হাত দু'খানা ঠিক সাড়াশির মত তার গলার দিকে এগিয়ে আসছে।

রীণা চিৎকার করে উঠে—হিরন্ময় তুমি আমাকে হত্যা করবে?

হিরন্ময় বলে উঠে—না হত্যা নয়, তোমাকে আমি বানাবো নীল কমল বুঝলে? ততক্ষণে হিরন্ময়ের কঠিন হাত দু'খানা রীণার গলায় শক্ত হয়ে চেপে বসেছে।

রীণা আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে—বাঁচাও, বাঁচাও আমি নীল সাগর তলে নীল কমল হতে চাইনা.........।